শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

রাজেন্দ্র লাইব্রেরী
১৩২, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড
(ক্যানিং ষ্ট্রীট), কলিকাতা-১

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য বই

ঈশ্বরের সন্ধানে
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ
বধূ-বরণ
কনে-চন্দন
তোমরা দু'জন
ক্রৌঞ্চ-মিথুন

প্রকাশক :
শ্রীরাজেন্দ্রকুমার গুপ্ত
'রাজেন্দ্র লাইব্রেরী'
১৩২, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড
(ক্যানিং স্ট্রীট), কলিকাতা-১

প্রথম প্রকাশ : ১৩৭৫ সাল।

মূল্য—চার টাকা।

মুদ্রাকর :
শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ
শ্রীহরি প্রেস
১৩৫এ, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭

শ্রীমান মাধব ঘোষাল
কল্যাণীয়েষু—

চোখের বালির জ্বালা জানে রে সবাই
চোখে যার চোখ পড়ে তার ওষুধ নাই রে
তার ওষুধ নাই।

—কাজী নজরুল ইসলাম

CHOKHEY JAR CHOKH PAREY
(*A Bengali Novel*)
by Sailajananda Mukhopadhyaya
1st. Edition : 1968
Price—Rs. 4'00

॥ ১ ॥

মায়ের ওই একটি মাত্র ছেলে নবীন। বি-এ পাশ করে বলছে আর পড়বে না।

—পড়বি না তো বিয়ে কর্!

তাও করবে না।

বিন্দুবাসিনী বিপদে পড়েছেন। রাজপুত্রের মতন ছেলে। রূপে গুণে কার্ত্তিক। কিন্তু স্বভাবটা হয়েছে ঠিক বাপের মত। নিজে যা ভাল বুঝবে তাই করবে। কারও কথা শুনবে না।

বাপ রেখে গেছে মস্ত জমিদারী, আর ওই ছেলে। এখন আবার শুনছে নাকি জমিদারী থাকবে না। বাড়ীতে একজন ম্যানেজার রয়েছেন। অনেক দিনের পুরনো লোক। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, জমিদারী যেতে এখনও দেরি আছে মা। জমিদারী যখন যাবে তখন আমিও চলে যাব।

নবীনকে জিজ্ঞাসা করলে বলে, জমিদারী যাবে, বাঁচা যাবে। ও-পাপ বিদেয় হলেই বাঁচি।

—সে কি কথা রে! বিন্দুবাসিনী বলেন, এত এত বিষয়-সম্পত্তি—চলে গেলে খাবি কি?

নবীন হেসে বলে, দুটো তো মানুষ, তুমি আর আমি। ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে মা, তুমি ভেবো না।

—ভাববো না কি রে? আমি কি চিরকাল থাকবো নাকি? আমি তো মরে যাব।

নবীন বলে, না তুমি মরবে না।

এই বলে নবীন চলে যাচ্ছিল। হাতে একটা দোনলা বন্দুক। কাঁধে একটা ঝুলানো ব্যাগ।

—কোথায় যাচ্ছিস রে ?

বিন্দুবাসিনী তার সঙ্গে সঙ্গে নামতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে। নবীন থমকে থামলো সিঁড়ির মাথায়। বললে, কোথায় যাব ঠিক জানি না। তবে মদনপুরের কাছারিতে একবার যাব ভাবছি।

—কেন ?

—সতীশ গোমস্তাকে একবার বলে আসি—এখন থেকে অন্য কোথাও সে একটা চাকরির চেষ্টা করুক।

—ফিরবি কবে ?

—তা জানি না।

সিঁড়ির একেবারে নীচের ধাপে নেমে দাঁড়িয়েছিল নবীন। মা তার কাছে এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়ালেন তার পথ আগলে। বললেন, বিয়ে তুই করবি কিনা বলে যা।

নবীন বললে, পরে বলবো।

—না পরে বলবো নয়, এক্ষুনি বলে যা। দিনরাত শুধু বন্দুক নিয়ে ট্যাং ট্যাং করে ঘুরে বেড়াবি, আর বিয়ের কথা বললেই এখন নয়, তখন নয়—

নবীন বললে, আর কয়েকটা দিন সময় দাও মা, আমি একটু ভেবে দেখি।

—ভেবে দেখবি কি রে! এখনও তোর এই কথা বলা সাজে ? তোর বয়েসের একটা ছেলে বের কর তো এই গাঁয়ে যার বিয়ে হয় নি।

নবীন একটু হাসলে। বললে, শুধু আমাদের গাঁয়ে কেন মা, সারা দেশটা খুঁজলেও হয়তো বের করতে পারবো না। কিন্তু কই তুমি বের কর তো মা এমন একটি ছেলে—বিয়ে করে মনের মত একটি বৌ নিয়ে যে বেশ মনের আনন্দে দিন কাটাচ্ছে।

মা বোধহয় রাগ করলেন। বললেন, তোর বক্তৃতা রাখ্। ও-সব আমি অনেক শুনেছি। আমার এই এত বড় বাড়ী,

একটা বৌ অভাবে খাঁ খাঁ করছে। আমার একটা সাধ-আহ্লাদ নেই ?

—কি করবে বল মা, তোমার অদৃষ্ট। ভাল একটি মেয়ে দেখতেও তো পাচ্ছি না ছাই, যে বিয়ে করে তোমার সাধ-আহ্লাদ মিটিয়ে দেবো।

বিন্দুবাসিনী এতক্ষণ পরে কেমন যেন একটুখানি আশ্বস্ত হলেন। বললেন, মেয়ে তুই দেখবি ?

—বারে, দেখবো না ? যাকে নিয়ে সারা জীবন কাটাতে হবে, বিয়ে করার আগে তাকে একবার চোখেও দেখবো না ?

—কি যে হয়েছিস বাবা, আজকালকার ছেলে তোরা! শেষে সায়েবদের মতন বলে না বসিস—কোর্টশিপ করে বিয়ে করবো।

নবীন বললে, যাক্ ও-সব তুমি বুঝবে না মা। আমি চললাম।

নবীন সত্যিই চলে গেল।

বিন্দুবাসিনী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন সেইদিকে তাকিয়ে। বাড়ীর চাকর বেরিয়ে যাচ্ছিল। বিন্দুবাসিনী বললেন, হরি, ম্যানেজারকে ডাক তো বাবা!

ম্যানেজার বিনোদবাবু তাঁর স্বামীর আমলের লোক। বিন্দুবাসিনী তাঁর সঙ্গে একটু সমীহ-সম্মান করে কথা বলেন। বিনোদবাবু আসছিলেন সেই দিক দিয়ে। হরি বললে, ওই তো!

বিনোদবাবু এসে দাঁড়ালেন।—'আমাকে ডাকছিলেন ?' মাথার কাপড়টা একটু তুলে দিয়ে বিন্দুবাসিনী বললেন, হ্যাঁ, ডেকেছি। টেলিগ্রামের একটা ফর্ম্ম নিয়ে আপনি আসুন আমার ঘরে।

বিনোদবাবু টেলিগ্রামের ফর্ম্মটা এনে বললেন, বলুন কোথায় টেলিগ্রাম করতে হবে।

বিন্দুবাসিনী বললেন, দার্জিলিং-এ আমার এক বন্ধু আছে— ইস্কুলের মাষ্টারনী, তাকে টেলিগ্রাম করে দিন সে যেন তার মেয়ে ইলাকে সঙ্গে নিয়ে অবিলম্বে এখানে চলে আসে। নিজে না

আসতে পরে, ইলাকে যেন পাঠিয়ে দেয়। ইলা একাই আসতে পারবে।

বিনোদবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কেন বলুন তো? দার্জিলিং-এ চিঠিও তো যায় একদিনে। টেলিগ্রাম করবার কি দরকার?

—টেলিগ্রামে আর চিঠিতে একটু তফাৎ আছে ম্যানেজারবাবু। চিঠি পেলে ভাববে দুদিন পরে গেলেও চলবে, আর টেলিগ্রাম পেলে তাড়াতাড়ি চলে আসবে। নবীন যে মেয়ে না দেখে বিয়ে করতে চাচ্ছে না।

ছেলে এখন বিয়ে করবে না—এই কথাটাই জানতেন বিনোদ-বাবু। সে যে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে এই যথেষ্ট। টেলিগ্রামটা লিখতে গিয়ে বিনোদবাবু কেমন যেন একটু ইতস্তত করছেন। কি যেন ভাবছেন তিনি।

বিন্দুবাসিনী সেটা লক্ষ্য করলেন। ভাবলেন বুঝি নাম আর ঠিকানার জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন। বললেন, নাম লিখুন, দীপ্তি ব্যানার্জি, বি-এ বি-টি। ১৭ নম্বর কার্ট রোড দার্জিলিং। টেলিগ্রামে বি-এ বি-টি না লিখলেও চলবে।

বিনোদবাবু মুখ তুলে তাকালেন। বললেন, একটা কথা বলবো মা? কিছু যদি মনে না করেন তো বলি।

বিন্দুবাসিনী বললেন, মনে কেন করবো? বলুন।

বিনোদবাবু বললেন, আমি আপনার কর্মচারী। কাজেই কথাটা বলা আমার ধৃষ্টতা। কিন্তু আপনি যখন অভয় দিচ্ছেন তখন বলি শুনুন। আমার একটি মেয়ে আছে আপনি জানেন। আমার ওই একটি মাত্র মেয়ে চাঁপা, কলকাতায় আই-এ পড়ছে। সবই আপনি জানেন। শুধু তাকে কোনো দিন দেখেননি।

কথাটা আর বাড়তে দিলেন না বিন্দুবাসিনী। বললেন, আপনি কি বলতে চান আমি বুঝেছি। তা বেশ তো, তাকেও

আসতে বলুন। নবীন ওকেও দেখুক। যাকে তার পছন্দ হবে তাকেই বিয়ে করবে।

বিনোদবাবু বললেন, আমার মেয়েও বিয়ে করবে না বলেছিল, কাজেই তার বিয়ের চেষ্টা আমি এতদিন করিনি। তবে এখন যখন বলছেন—নবীন বলেছে মেয়ে দেখে তার যদি পছন্দ হয় তো বিয়ে করবে, তাই বলতে সাহস পাচ্ছি। আমার মেয়ে দেখতে খারাপ নয়।

বিন্দুবাসিনী বললেন, তু'জনকে তুখানা টেলিগ্রাম করে দিন।

বিনোদবাবু বললেন, না মা, আমার মেয়েকে আমি টেলিগ্রাম করবো না। বুঝিয়ে সুঝিয়ে চিঠি লিখবো। টেলিগ্রাম করলে সে আসবেই না।

তাই ঠিক হলো। দার্জিলিং-এ টেলিগ্রাম করবেন আর কলকাতায় লিখবেন চিঠি।

বিন্দুবাসিনী এইবার তাঁর মনের কথা খুলে বললেন। বললেন, লেখাপড়া জানা কোনও আধুনিকা আমার বৌ হয়ে আসবে তা আমি কোনোদিনই ভাবিনি ম্যানেজারবাবু। আমি ভেবেছিলাম, সম্ভ্রান্ত বংশের একটি সুন্দরী মেয়ে আসবে আমার বৌ হয়ে। লেখাপড়া সামান্য একটুখানি জানলেই চলবে। কিন্তু ছেলে বোধ হয় তা চায় না।

বিনোদবাবু বললেন, ছেলে যা চায় তাই তো আপনাকে করতে হবে মা।

বিন্দুবাসিনী চুপ করে রইলেন। কথাটার জবাব দিলেন না।

॥ ২ ॥

ছোট্ট একটি মিটার-গেজের ট্রেণ চলেছে একটি খালের পাশ দিয়ে। লাইনের তুদিকে আম আর জামের গাছ, আর তার মাঝে মাঝে অজস্র সাদা কাশ-ফুল ফুটেছে। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে জায়গাটা।

হঠাৎ একটা লেবেল ক্রসিং-এর আগে ট্রেণটা দাঁড়িয়ে পড়লো। রাস্তা দিয়ে অনেকগুলো গরুর গাড়ী চলেছে একসঙ্গে।

নবীন নেমে পড়লো গাড়ীর দরজা খুলে। দূরে একটা গাছের ডালে মনে হলো সে যেন একটা পাখী দেখতে পেয়েছে। বন্দুক হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল সেই দিকে।

হঠাৎ বন্দুকের একটা আওয়াজ শুনে গাড়ীর লোকেরা সচকিত হয়ে উঠলো।

এদিকে গাড়ীতে তখন 'হুইসল্' দিয়েছে। গরুর গাড়ীগুলো পার হয়ে গেছে। ট্রেণ আবার চলবে।

—ও মশাই, আসুন! গাড়ী ছেড়ে দিলে যে! ট্রেণের একজন সহৃদয় যাত্রী নবীনকে ডাকতে লাগলো।

গাড়ী তখন সত্যিই চলতে আরম্ভ করেছে। ছোঁড়াটার কাজ ছাখো! ঠিক এই সময় গেল পাখী মারতে।

কিন্তু নবীনের ফিরে আসার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। সে তখন কাশঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

নবীন গুলি করেছিল, পাখীটা কিন্তু মরেনি। পাখী মারবার নেশা তখন তাকে পেয়ে বসেছে। গাড়ী ছেড়ে দিয়ে ছুটলো সে তার পিছু পিছু।

গাড়ী ছেড়ে দিয়ে ক্ষতি তার কিছু হয়নি। সুমুখে যে গ্রামটা

দেখা যাচ্ছে—এই ঝিলিমিলি গ্রামেই সে আসছিল। ট্রেণ থেকে নামতো গিয়ে ষ্টেশনে, তা না নেমে, নেমেছে লাইনের ধারে। খানিকটা হাঁটতে হবে—এই যা।

হাঁটতে তো হবেই। ঘুঘু-পাখীটা উড়েছে। তার পিছু পিছু ছুটতে হলো নবীনকে। ঘুঘু-পাখীরা কখনও একা একা যাবে না। জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়ায় তারা। প্রেমিক-প্রেমিকায় খুব ভাব। একটা বসে উত্তর দিকের গাছে তো আর একটা চলে যায় দক্ষিণে। তারপর চলতে থাকে তাদের প্রেমালাপ। পুরুষ-ঘুঘুটা ডাকে ঘু-ঘু! স্ত্রী-ঘুঘু তার জবাব দেয়। কি যে বলে তারা কে জানে। পল্লীপ্রান্তের ঝিমিয়েপড়া নিস্তব্ধ দুপুরে বেশ একটা আমেজ লাগে।

কিন্তু এই ঘুঘুর জোড়াটা গেল কোথায়?

ওপরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নবীনও চলে, ঘুঘুটাও চলে—এ-গাছ থেকে ও-গাছ, এ-ডাল থেকে ও-ডাল। উড়তে উড়তে পাখীটা গিয়ে বসলো একটি মন্দিরের চূড়ায়।

ঝিলিমিলি গ্রামে নবীন এসেছে আরও দু'একবার। আসতে হয়েছে তাকে—তার বাবার মৃত্যুর পর। এসেছে হয়ত ঘণ্টা-খানেকের জন্য। তাদেরই কাছারি বাড়ীতে গিয়ে বসেছে। সতীশ গোমস্তার সঙ্গে কথা বলেছে। আবার চলে গেছে।

গ্রামের পথ-ঘাট তার চেনা।

যে-মন্দিরের চূড়ায় গিয়ে বসলো পাখীটা, সে-মন্দির তারই পিতামহের প্রতিষ্ঠিত গোপালের মন্দির।

বন্দুকটা হাতে নিয়ে নবীন একটা গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালো। শিকারের নেশা বড় বিশ্রী নেশা। যার পেছনে ছোটে সহজে তাকে আর ছাড়তে চায় না।

নবীন তার বন্দুকটা একবার তুললে। তুলেই আবার নামিয়ে

নিলে। সরে গেল আর একটা গাছের তলায়। মন্দির থেকে পাখীটা যদি ওড়ে তো বড় ভাল হয়।

পাখী কিন্তু কিছুতেই উড়লো না। বন্দুকের আওয়াজ শুনেই উড়েছে সে। বুঝতে পেরেছে কিনা তাই-বা কে জানে। সাথী-হারা পাখী প্রাণের ভয়ে এই মন্দিরে এসে আশ্রয় নিলে—এমনও হতে পারে।

না, আর অপেক্ষা করা চলে না। হাতে বন্দুক। সুমুখে পাখী। নবীন চট্ করে বন্দুকটা তুলে ধরেই দিলে চালিয়ে। ভয়ঙ্কর একটা আওয়াজ হলো। আর সেই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ঝট্‌পট্ করতে করতে পাখীটা এসে পড়লো একেবারে মন্দিরের দরজায়।

মরেনি পাখীটা। সীসের একটি ছররা বোধ করি লেগেছে তার পাখায়। তখনও সে পাখাদুটো মেলে উড়ে পালাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না।

মন্দিরের ভেতর থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এলো। সুন্দরী এক যুবতী।

ওদিক থেকে নবীনও তখন এসে দাঁড়িয়েছে। জুতো পায়ে দিয়ে মন্দিরে উঠতে পারে না। তাই সে একবার সেইখান থেকেই হাত বাড়ালে পাখীটাকে নেবার জন্যে।

মেয়েটি কিন্তু তখন দুহাত বাড়িয়ে আহত পাখীটিকে তুলে ধরেছে তার বুকের কাছে। থর্ থর্ করে কাঁপছে পাখীটা।—আহা বেচারা!

নবীনের দিকে একবার তাকালে মেয়েটি।

চেনে না কেউ কাউকে। দু'জন দুজনকে দেখলে শুধু। চোখে চোখে দেখা। কারও মুখে কোনও কথা নেই।

মেয়েটি দাঁড়ালো না। তাড়াতাড়ি ঢুকলো গিয়ে মন্দিরের ভেতর। গোপালের বিগ্রহের পায়ের কাছে সযত্নে পাখীটিকে

নামিয়ে দিয়ে চোখ বুজে আপন-মনেই কি যেন বললে, তারপর বাঁ হাত দিয়ে তার ঠোঁট দুটি ফাঁক করে ঠাকুরের চরণামৃত তার মুখের ভেতর ঢেলে দিতে লাগলো।

নবীন বাইরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলে। এমনটি যে হবে তা সে ভাবতে পারেনি। কে এই মেয়েটি? গোপাল-মন্দিরের পুরোহিতের একটি মেয়ে আছে শুনেছে। এই মেয়েটি সেই তারই মেয়ে কিনা তাই-বা কে জানে!

যেই হোক, আর ভাবতে পারে না!

পাখীর সন্ধানে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে নবীন এগিয়ে চললো গ্রামের পথে। কিন্তু মনের ভাবনা জোর করে থামানো যায় না। তিন-তিনটে ঘুঘু এসে বসলো চোখের সামনে, তবু তার হাত উঠলো না। চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠতে লাগলো সেই একই ছবি। মন্দিরের সেই মেয়েটি! লাল চওড়াপাড় শাড়ী তো অনেক মেয়েই পরে, কিন্তু অত সুন্দর তো দেখায় না! সস্তা ছিটের আঁটসাঁট একটা জামা ছিলো গায়ে, আর পিঠের ওপর ছড়ানো ছিল একপিঠ কালো চুল। সিঁথিতে সিঁদুর ছিল না। শুধু তার দুটি ভুরুর মাঝখানে ছিল ছোট্ট একটি সিঁদুরের টিপ। শুচিস্নিগ্ধ পূজারিণীর মত দেখতে।

আধমরা পাখীটাকে বুকের ওপর চেপে ধরে সোজা সে তাকিয়েছিল তার মুখের দিকে। টানা টানা চোখের কালো দুটি তারা মনে হয়েছিল যেন কাঁপছে থর্ থর্ করে।

কিন্তু সে কতক্ষণের জন্যই-বা! তক্ষুনি সে পেছন ফিরে ঢুকে পড়েছিল মন্দিরের ভেতর।

মেয়েটি মুখে একটি কথাও বলেনি। তবু নবীনের মনে হলো —কিছু যেন বলেছিল।

চোখের যে ভাষা আছে, চোখও যে কথা বলতে পারে তা সে আগে জানতো-না। সেইদিনই যেন সে প্রথম দেখলে।

সুমুখে কাছারি বাড়ী। ইঁটের তৈরী ছোট্ট একটি দোতলা—ছাদটা শুধু রাণীগঞ্জের টালির। সদরের কপাট দুটো ভেজানো ছিল ভেতর থেকে। নবীন সোজা ঢুকে পড়তে পারতো। চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু ঢুকতে গিয়ে পড়লো বিপদে। একটা কপাট একটুখানি ফাঁক করতেই যে-দৃশ্য তার নজরে পড়লো, তা দেখে আর ঢোকা চলে না। কাজেই দরজাটা আবার তেমনি টেনে দিয়ে ছোট্ট সেই ফাঁকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইলো সে চুপটি করে।

ভেতরে ঝগড়া চলছে স্বামী-স্ত্রীর।

সতীশ গোমস্তার স্ত্রী হাতে একটা চ্যালা কাঠ নিয়ে তেড়ে মারতে এসেছে সতীশকে। সতীশ বলছে, মেরো না মাইরি, মেরো না। আমি তাহ'লে কিছু বাকি রাখবো না—হ্যাঁ।

—না রাখলে তো আমার বয়েই গেল।

বলতে বলতে আরও খানিকটা এগিয়ে এলো মেয়েটা।

এইবার বুঝি দিলে বসিয়ে!

নবীনের আর চুপ করে থাকা চললো না। তক্ষুনি চেঁচিয়ে ডেকে উঠলো, সতীশ!

ভেতরের গোলমালটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

সতীশের স্ত্রীও থামলো। সতীশও থামলো। ভেতর থেকে সতীশ বলে উঠলো, কে?

নবীন বললে, দরজা খোলো!

গলার আওয়াজ শুনে বুঝতে পারেনি সতীশ। তাই সে ভেতর থেকে বলে উঠলো, পারবো না খুলতে। লাট-সায়েব—বলে কি না দরজা খোলো!

বলেই সে এগিয়ে এলো দোরের কাছে। আরও কি যেন সে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু দরজা খুলেই একেবারে—থ।

এরকম সময়ে বন্দুক হাতে নিয়ে নবীনকে দাঁড়িয়ে থাকতে

দেখবে—তা সে কল্পনাও করেনি। লজ্জায় সতীশ যেন একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গেল। গোলগাল বেঁটে খাটো মানুষটি যেন বেঁটে হয়ে গেল। আধ হাত জিব বের করে তাড়াতাড়ি প্রণাম করবার জন্যে হাত বাড়ালে নবীনের পায়ের দিকে।

নবীন চট্ করে খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে প্রণাম তাকে করতে দিলে না। বললে, প্রণাম করছো কি? আমি তোমার চেয়ে অনেক ছোট।

এই বলে নবীন ভেতরে ঢুকলো।—'মাথাটা কী তোমার খারাপ হয়ে গেল সতীশ?'

—খারাপ হতে আর দোষ কী হুজুর! ওই দেখুন!

বলে আঙুল বাড়িয়ে সতীশ যাকে দেখিয়ে দিলে—সে তার স্ত্রী।

মেয়েটি তখনও তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। হাত থেকে চ্যালা কাঠটা ফেলে দিয়ে এমন প্যাট্ প্যাট্ করে তাকাচ্ছে নবীনের দিকে—মনে হচ্ছে যেন সে তাকে এই প্রথম দেখলে।

নবীনেরও তাকে দেখবার সৌভাগ্য এই প্রথম। এর আগে যত বার সে এসেছে এখানে, অসূর্যম্পশ্যা ভদ্রমহিলা অন্দরমহল থেকে কোনদিনই বেরিয়ে আসেনি এমন করে।

নবীন দেখল তাকে প্রাণ ভরে। দুনিয়ায় যে আমরা শুধু ভাল জিনিসটাই প্রাণ ভরে দেখি—তা নয়। এমন মন্দও আছে এ-পৃথিবীতে যেদিকে একবার চোখ পড়লে আর সহজে চোখ ফেরানো যায় না। সতীশ যেমন বেঁটে, সহধর্মিণীটি তার তেমনি লম্বা। লম্বা মানুষ সাধারণতঃ রোগাই হয়ে থাকে, কিন্তু এ এক অদ্ভুত ধরনের রোগা। কোমর থেকে শরীরের ওপরের দিকটা একরকম, নীচের দিকটা অন্যরকম। মুখ, নাক, দাঁত, এমনকি কান দুটো পর্যন্ত অস্বাভাবিক রকমের লম্বা। লম্বা কিন্তু স্বাস্থ্যহীনা নয়। গায়ের রংটা কালো।

কাছারির উঠোনটা পেরিয়েই সতীশের কোয়ার্টার। দেয়ালগুলো

মাটির, চালটা খড়ের। বাড়ীটা নেহাৎ ছোট নয়। তারই একটা দোরের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সতীশের স্ত্রী।

সতীশ বললে, দাঁড়িয়ে দেখছো কি? বাবুকে একগ্লাস সরবৎ দাও।

সত্যিই তো! মনিব এসেছে কাছারিতে। এ সময় এমন করে তার দাঁড়িয়ে থাকা চলে না।

সতীশের স্ত্রী ডাকলে, কে আছিস এখানে?

ডাকবামাত্র একটি মেয়ে বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে।

সতীশের স্ত্রী বললে, আ-মর্! তোকে কে ডাকলে? মেয়েটি কিন্তু সেকথায় কান দিলে না। চমৎকার সুন্দরী মেয়ে, কমনীয় মুখশ্রী। মাথার কাপড়টা একটু তুলে দিয়ে ধীরে-ধীরে এসে দাঁড়ালো সতীশের স্ত্রীর কাছে। তারই ফাঁকে সে একবার নবীনকে দেখে নিলে।

একটা ইজি চেয়ার পাতা ছিল কাছারির ঢাকা বারান্দায়। নবীন তখন তার হাতের বন্দুকটা নামিয়ে সেইখানে বসে পড়েছে।

সতীশ বললে, ওপরে আপনার ঘরে গিয়ে বসলেই পারতেন।

নবীন বললে, না। এইখানেই বসি। বেশ লাগছে জায়গাটা।

তা বেশ লাগবার মত জায়গাই বটে! কাছারির উঠোনে কয়েকটা ফুলের গাছে অজস্র ফুল ফুটেছে। পাঁচিলের গায়ে গায়ে পেয়ারা, লেবু, লিচু আর পেঁপের গাছ। নবীনের বাবার সখ ছিল, তাই তিনি এই কলমের গাছগুলো লাগিয়েছিলেন নিজের হাতে। এখন সেগুলো বেশ বড় হয়েছে। অজস্র লেবু আর পেয়ারা ধরেছে প্রত্যেকটি গাছে। লিচু গাছে মুকুল ধরেছে।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, ওইটি কি তোমার ছেলের বৌ?

সতীশ তাকালে সেইদিকে। বৌটি তখন একটা লেবুগাছের কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে লেবু তুলছে বোধ করি সরবৎ করবার জন্যে।

সতীশ বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, ওইটি আমার বড় বৌ। আর ওই যে পেত্নী—ওই আমার স্ত্রী।

কথাটা এমন ভাবে বললে—যেন সে শুনতে না পায়। বলেই নবীনের পায়ের কাছে মেঝের ওপরেই বসে পড়লো সতীশ। বললে, জীবনে আমার সুখ নেই বাবু। চব্বিশ ঘণ্টা মনে হয় যেন মরে গেলেই বাঁচি।

সে কি কথা! নবীন জিজ্ঞাসা করলে, তোমার ছেলে-পুলে ক'টি?

সতীশ বললে, জানেন না?

—না।

—সে-কথা আর বলেন কেন বাবু। ছেলে বড়—ওই তো বৌ দেখলেন তার। তার পর তিনটি মেয়ে। তিনটির ভেতর দুটি গেছে, একটি আছে।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, গেছে মানে? বিয়ে হয়ে গেছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার বাবার কাছে টাকা নিয়ে বিয়ে দিয়েছিলাম। বিয়ের পরে বড় মেয়েটা ঝগড়া-ঝাঁটি করলে জামাইএর সঙ্গে। তারপর একদিন গলায় কাপড়ের ফাঁস লাগিয়ে দিলে জীবনটাকে শেষ করে!

নবীন বললে, তার পর?

—তার পর? তার পরের মেয়েটার বিয়ে দিলাম। এ যা করলে তা আর বলবার নয়। হঠাৎ একদিন কোথায় যে পালিয়ে গেল তার আর হদিস পেলাম না। এখন রয়েছে মাত্র ছোট মেয়েটি।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, এরও বিয়ে দিয়েছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দিয়েছি। ওই যে দেখুন না, এইদিকে তাকান!

এই বলে সে আঙুল বাড়িয়ে উঠোনের যে-দিকটা দেখিয়ে দিলে, নবীন দেখলে, সেই দিকে ঝোপ-ঝোপ একটি গাছের তলায় বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক বসে বসে তামাক খাচ্ছে।

সতীশ বললে, ওই আমার ছোট জামাই।

কথাটা শুনে নবীনের চোখদুটো কেমন যেন বড়-বড় হয়ে গেল। মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে এলো—তোমার জামাই?

দেখলে কিন্তু বিশ্বাস হয় না।

লোকটি বোধহয় সতীশের চেয়ে বয়সে বড়।

নবীন আবার জিজ্ঞাসা করলে, উনি তোমার জামাই?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সতীশ বললে, আমাদের কুলীন বামুনের ঘরে ওরকম হয়েই থাকে।

কথাটা বোধ করি জামাইটি শুনতে পেয়েছিল।

হুঁকোটি হাতে নিয়েই সে উঠে এলো। নবীনের কাছে এসে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। এইটি আমার তৃতীয় পক্ষ।—আপনি কে? আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।

সতীশ বুঝিয়ে দিলে। বললে, আমার মনিব। এখানকার জমিদার।

'জমিদার' কথাটা শুনে জামাই-ভদ্রলোক একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলে। দন্তহীন মুখের সে হাসিটি বড় চমৎকার। ডান হাতের দুটি আঙ্গুলে-আঙ্গুলে চুটকি বাজিয়ে বললে, জমিদারী তো আর দিন-কতক বাদেই—ফট্।

নবীন তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, সেই কথাই বলতে এসেছি আপনার শ্বশুরকে। অন্য কোথাও একটা চাকরি-বাকরি দেখুক।

—তা' আমাকে বলছেন কেন? শ্বশুরের ভাবনা শ্বশুর ভাববে।

কথাটা বলে সে তার হুঁকোটি দোরের চৌকাঠের গায়ে নামিয়ে রেখে বাঁশের মোড়াটা টেনে এনে বসলো। বললে, ভালই হলো। আমার নালিশটা বলি আপনাকে।

সতীশ কাছেই দাঁড়িয়েছিল। জামাইএর দিকে কটমট করে তাকিয়ে সে চীৎকার করে উঠলো: পশুপতি!

জামাইএর নাম পশুপতি।

পশুপতি বললে, কি বলছেন ?

সতীশ বললে, নালিশ মানে ? আমি কি খুন-খারাপি কিছু করেছি যে তুমি নালিশ করবে বলছো ?

—বেশ তো, যা করেছেন সেই কথাটাই বলি। উনি যখন আপনার মনিব, উনি তার বিচার করে দিন।—আচ্ছা বলুন তো মশাই, বিয়ে মানুষ করে কিসের জন্যে ?

বড় কঠিন প্রশ্ন! নবীনের পক্ষে চট করে জবাব দেওয়া শক্ত।

সতীশ বললে, শুনুন তাহ'লে। ব্যাপারটা কি হয়েছে আমিই বলি। জামাই-বাবাজী বলছে আমার কন্যাটিকে সে নিয়ে যাবে।

পশুপতি বললে, অন্যায় কিছু বলেছি ? বিয়ে-করা বৌ—বাড়ী নিয়ে যাব না ?

সতীশ বললে, থামো তুমি। আমাকে বলতে দাও।

—বেশ তাই বলুন। দেখে মনে হচ্ছে উনি শিক্ষিত ছোক্‌রা। সবই বুঝতে পারবেন।

সতীশ বললে, মেয়ে শ্বশুরবাড়ী যাবে—জামাই নিতে এসেছে, আমি বাধা দিতে যাব কেন ? কিন্তু আমার হয়েছে এক বিপদ। মেয়ে বলছে কিছুতেই যাবে না। জোর করে যদি পাঠাই তো বলছে ওর দিদিরা যা করেছে—

এই পর্যন্ত বলে আর সে বলতে পারলে না। মুখের চেহারাটা কেমন যেন হয়ে গেল। খানিক থেমে একটুখানি সামলে নিয়ে বললে, তিনটের ভেতর তো ওই একটাতেই ঠেকেছে। তার ওপর এইটে সবার ছোট।

বেদনাটা যে তার কোথায়—পশুপতি তা' জানতে চায় না। বললে, শুনুন, বাপের আছুরে মেয়ে। তাই উনি ওঁকে ছাড়তে চান না।

—আজ্ঞে না, তা ঠিক নয়। সতীশ বললে, দুঃখের কথা কি

বলবো বলুন, মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে খাটিয়ে খাটিয়ে মারবে। আমার জামাইয়ের আগের পক্ষের তিনটি বিধবা মেয়ে, তাদের একগাদা ছেলেমেয়ে—ঘর একেবারে ভর্তি। দু'বেলা সেই একগুষ্টি লোকের রান্না করতে হয়। অথচ পশুপতির অবস্থা খারাপ নয়। ইচ্ছে করলেই একটা ঝি একটা রাঁধুনী ও রাখতে পারে।

পশুপতি বলে উঠলো, কেন রাখবো শুনি? নিজের বিয়ে-করা বৌ থাকতে রাঁধুনী কেন রাখতে যাব? কে রাখে, কোথায় রাখে —আমাকে দেখাতে পারেন?

সতীশ বললে, তাহ'লে লোকজন তুমি রাখবে না? আমার ওই মেয়েটাই তোমার সাতগুষ্টির রান্না করবে?

—আলবাৎ করবে। বিয়ে আমি করেছি কিসের জন্যে? ছেলেমেয়ের সাধ-আহ্লাদ আমার মিটে গেছে। তৃতীয় পক্ষে বিয়ে করলাম, ভাবলাম গরীবের মেয়ে, ঘর-সংসারের কাজকর্ম করবে, দুবেলা পেট ভরে খেতে পাবে—

সতীশ তার কথার ওপরেই বলে উঠলো, মুখ সামলে কথা বল পশুপতি। মেয়ে আমার এখানেও পেট ভরে খেতে পায়।

পশুপতিও চুপ করে থাকবার মানুষ নয়। সেও চীৎকার করে উঠলো, আপনিও মুখ সামলে কথা বলুন।

নবীন তাদের থামিয়ে দিলে।—পশুপতিকে বললে, চুপ করুন, আপনি চুপ করুন।

—আচ্ছা, চুপ করলাম। কল্‌কেটা আমার পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

এই বলে পশুপতি তার হুঁকোটা আবার তুলে নিলে।

আর ঠিক সেই সময়ে সতীশের বাড়ী থেকে আঠারো উনিশ বছরের একটি মেয়ে বেরিয়ে এলো নবীনের জন্যে সরবৎ নিয়ে। সরবৎ আর জল নামিয়ে দিয়েই মেয়েটি চলে যাচ্ছিল, সতীশ বললে, যাচ্ছিস কোথায়? শোন্!

ফিরে দাঁড়িয়েই মেয়েটি তার মাথার কাপড়টা একটুখানি তুলে দিলে। সতীশ বললে, এই আমার ছোট মেয়ে—উমা। বাবুকে প্রণাম কর।

উমা নবীনের মুখের দিকে একবার ভাল করে তাকালে। নবীনও তার দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারলে না। এই মেয়েটিই ওই বৃদ্ধ পশুপতির স্ত্রী। রং ফরসা নয়, কিন্তু স্বাস্থ্যবতী তরুণী।

উমা মাথা হেঁট করে নবীনের পায়ে হাত দিয়ে তাকে একটি প্রণাম করলে। একবার হাসলে তার দিকে তাকিয়ে। একরকম হাসি আছে, যে-হাসিতে অন্তরের বেদনার ছায়া পড়ে। দেখলে মনে হয় অত্যন্ত করুণ। নবীন বোধ হয় সেই রকম কিছু প্রত্যাশা করেছিল উমার মুখে। কিন্তু দুঃখ-বেদনার লেশমাত্র আভাস—কোথাও সে দেখতে পেলে না। না তার মুখে, না তার হাসিতে।

তারপর সে একরকম ছুটেই চলে গেল সেখান থেকে।

নবীন সরবতের গ্লাসটা মুখে দিয়ে ভাবছিল এই মেয়েটির কথা। হয়ত-বা জীবন সম্বন্ধে কোনও বোধই তার নেই। কিংবা হয়ত একেবারে উদাসীন।

গড় গড় করে হুঁকো টানার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে পেছন থেকে। গুরুজন শ্বশুর রয়েছে সুমুখে, তাই আড়ালে বসে পশুপতি তামাক খাচ্ছে।

সতীশ দাঁড়িয়েছিল কাছেই, নবীন বললে, বোসো। সেই থেকে দাঁড়িয়ে রইলে যে।

সতীশ বললে, ঘন্টার পর ঘণ্টা আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। আমার অভ্যেস আছে।

নবীন যে-কথাটা বলতে চাচ্ছিল, মুখ থেকে সেটা যেন আপনা থেকেই বেরিয়ে এলো। বললে, তোমার জামাইটির বয়েস সত্যিই বেশি।

সতীশ যে তা' জানে না তা' নয়। ততখানি নির্বোধ তাকে বলা চলে না। তবে কথাটা যেন সে নিজের কাছেও আমল দিতে চায় না। চললে, বাঁধানো দাঁতগুলো খুলে রেখেছে কি না, তাই মনে হচ্ছে বুড়ো। কিন্তু যতখানি বুড়ো ওকে মনে হয়, ও ততখানি বুড়ো নয়।

পশুপতির মনের মত কথা।

হুঁকোর শব্দটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। পশুপতি বলে উঠলো, ঠিক বলছেন।

সতীশ বললে, জামাইএর অবস্থাও খারাপ নয়। বাড়ীঘর জমি-জায়গা বেশ ভাল দেখেই আমি বিয়ে দিয়েছি। দোষের মধ্যে দোষ—ওই তো বললাম—একটু কৃপণ। হাতটান আছে।

দপ্ করে যেন জ্বলে উঠলো পশুপতি। হুঁকোটা সরিয়ে রেখে বললে, আবার সেই কথা?

সতীশ বললে, মিছে কথা নয়। তুমি চুপ কর।

পশুপতি জবাব দিলে, আপনি চুপ করুন।

সতীশ বললে, আমি চুপ করবো না।

পশুপতি এগিয়ে এলো। বললে, বেশ, তবে মেয়ে আপনি কেমন করে না পাঠান দেখাচ্ছি।

—জোর করে নিয়ে যাবে, না কী বলতে চাও তুমি?

—নিশ্চয়। রীতিমত বিয়ে-করা বৌ। জোর করে নিয়ে যাবার অধিকার আমার আছে।

—পারবে না। কখ্খনো পারবে না।

পশুপতি বললে, না পারি, আদালত আছে।

সতীশ বললে, বেশ তবে তাই হোক। তুমি আদালতেই যাও।

—তাই যাব।

বলেই হুঁকোটি হাতে নিয়ে পশুপতি আবার তার সেই গাছের তলার আসনটিতে গিয়ে বসলো।

নবীন বললে, এবার আমি উঠি সতীশ। হ্যাঁ শোনো, যে-কথাটা আমি বলতে এসেছিলাম—

কথাটা যেই সে বলতে যাবে, বাইরের দোর খুলে একটি লোক এসে দাঁড়ালো। লম্বা চওড়া জোয়ান সুপুরুষ, ফর্সা ধপধপ করছে গায়ের রং, গলায় শুভ্র যজ্ঞোপবীত, খালি গা, খালি পা, পরনে পট্ট-বস্ত্র, মাথায় বড় বড় বাবরি চুল। এসেই সে বললে, কোথায়? আমাদের জমিদারের ছেলে না কে এসেছে শুনলাম—

—হ্যাঁ, এই তো! বলে সতীশ নবীনকে দেখিয়ে দিলে।

নবীন জানতো, তাদের গোপাল-মন্দিরের একজন পুরোহিত আছে এমনি চেহারার। কিন্তু চোখে কোনো দিন দেখেনি। কেউ কাউকে চেনে না।

নবীন তাকালে সতীশের দিকে। সতীশ তাকে চিনিয়ে দিলে। বললে, ভৈরব আচার্য। আপনাদের গোপাল-মন্দিরের পুরোহিত। আপনার বাবার সঙ্গে ওর খুব ভাব ছিল।

নবীন তাড়াতাড়ি ভৈরবের কাছে গিয়ে গড় হয়ে তাকে একটি প্রণাম করলে।

তাদেরই চাকরি করে গ্রাম্য একজন পুরোহিত মাত্র, তাকে এতখানি খাতির করে প্রণাম করবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। সতীশ বললে, ওকে আবার অত কেন?

কথাটা যেন ভৈরবকে শুনিয়েই বলা হলো।

নবীন বেশ রাগ করেই তাকালে সতীশের দিকে।

সতীশ বুঝিয়ে দিলে, ভয় নেই, ও কানে ভাল শুনতে পায় না। কালা।

ওদিকে ভৈরবের তখন এমন অবস্থা যে, তার মুখ দিয়ে আর কথা বেরুচ্ছে না। নবীন একটা প্রণাম করে তার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়েই দিয়েছে সব গোলমাল করে। এতটা যে করবে তা' সে আশা করেনি।

ভৈরব এসেছিল নবীনকে তিরস্কার করতে। সে-কথা সে বলেই ফেললে। তার কথা বলার ধরনটাই আলাদা। বললে, খুব রাগ হয়েছিল আমার। ভেবেছিলাম, খিঁচে একটি চড় মারবো তোমাকে। তুমি কিনা গোপালের মন্দিরে বন্দুক দিয়ে একটা পাখী মেরে এলে? মন্দিরে রক্তের দাগ পড়লো!

নবীন বললে, সত্যিই, বড় অন্যায় হয়ে গেছে।

সতীশ বলে দিলে, জোরে বলুন। শুনতে পাবে না। ও কালা।

নবীন আবার বললে, সত্যিই খুব অন্যায় করে ফেলেছি আমি।

অন্যায় কথাটা শুনতে পেলে ভৈরব। বললে, আমি জানি। তোমার বাবা আমার মনিব ছিলেন, বন্ধুও ছিলেন। ও-রকম মানুষ আর হবে না। তুমি তার ছেলে। সেই তুমি আজ আমাকে প্রণাম করলে। আমার সব রাগ জল হয়ে গেল।

বলতে বলতে চোখ দুটো তার সজল হয়ে এলো।

নবীন আবার বললে, আপনি আমার পিতৃতুল্য। আমার অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন।

—সে আর বলতে হবে না তোমাকে। চললাম।

সতীশ জিজ্ঞাসা করলে, পূজো কি এখনও করনি?

ভৈরব বললে, না। কার পূজো করবো? জীবহত্যা যেখানে হয়, ঠাকুর তো সেখানে থাকে না। যাই—দেখি, যদি ফিরিয়ে আনতে পারি।

এই বলে ভৈরব যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল।

সতীশ হাসলে একটু বিদ্রূপের হাসি। বললে, পাগল! বলেই সে তার পিছু পিছু গেল বোধ করি দোরটা বন্ধ করতে।

নবীন আর এখানে থাকবে না। যাত্রাটা বড় অশুভ হয়ে গেছে। মা তাকে বারণ করেছিল আসতে। মা'র বারণ তার শোনা উচিত ছিল। বন্দুকটা সে তুলে নিলে। দোনলা বন্দুকটা

দু'হাত দিয়ে ধরে মনে মনে বোধ করি প্রতিজ্ঞা করলে, আর সে কোনোদিন তা' স্পর্শ করবে না।

ওদিকে ঠিক সেই সময়েই দেখা গেল, পাখীটা সুস্থ হয়ে গোপালের মন্দির থেকে উড়ে চলে গেল।

দোরটা বন্ধ করে সতীশ ফিরে আসছিল।

নবীন বললে, দোর বন্ধ করলে কেন, খোলো। আমি যাব।

সতীশ বললে, তাই কি হয় কখনও বাবু? এই অসময়ে না খাইয়ে আপনাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি কখনও?

নবীন কিছুতেই থাকবে না। বললে, না, আমাকে যেতেই হবে।

বন্দুকটা হাতে নিয়ে সে দোরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় বিকট একটা কান্নার আওয়াজ শুনে থমকে তাকে থামতে হলো। তাকিয়ে দেখলে, সতীশের বাড়ীর দরজা থেকে ছিট্‌কে একটি মেয়ে এসে একেবারে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়েছে কাছারির উঠোনে। পরনের কাপড়টা কোনোরকমে সামলে নিয়ে উঠে যখন সে দাঁড়ালো, নবীন চিনতে পারলে—এ সেই সুন্দরী মেয়েটি, কিছুক্ষণ আগে বাগানের গাছ থেকে যাকে সে লেবু তুলতে দেখেছিল। সতীশ বলেছিল, ওইটি আমার ছেলের বৌ।

মেয়েটির কপাল কেটে গিয়ে দর দর করে কাঁচা রক্ত গড়াচ্ছে। কাঁদতে কাঁদতে বলছে, আমি চলে যাচ্ছি মা, আমার ছেলে দাও, আমি চলে যাচ্ছি।

সতীশের স্ত্রী এসে দাঁড়িয়েছে দোরের কাছে। তার কোলে একটি ফুটফুটে ভারি সুন্দর ছেলে। মনে হচ্ছে যেন সতীশের স্ত্রীই তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। বললে, ছেলে দেব! না দিলেই নয়?

বৌটি আবার বললে, তোমার পায়ে পড়ি মা, আমার খোকনকে দিয়ে দাও। আমি আর কখ্‌খনো এখানে আসব না।

সতীশের স্ত্রীর সেই এক কথা। ছেলে সে কিছুতেই দেবে না। বললে, ছেলে আমি দেবো না। ছেলে আমাদের।

ছেলেটাও হাত বাড়িয়ে কাঁদছে তার মায়ের কোলে যাবার জন্যে।

বৌ আর চুপ করে থাকতে পারলে না। ছুটে একেবারে ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়লো—-হাত বাড়িয়ে ছেলেটাকে কেড়ে নেবার উদ্দেশ্যে।

কিন্তু পারলে না কেড়ে নিতে। পারবে কেন ওই দজ্জাল শাশুড়ীর সঙ্গে ?

শাশুড়ী-ঠাকরুণ তখন ছেলেটাকে তার কোলের ওপর বেশ করে চেপে ধরে হাত দিয়ে বৌটাকে এমন ঠেলা মারলে যে আবার সে উল্‌টে এসে পড়লো উঠোনে। মেয়েটা টাল্‌ সামলে নিলে অতি কষ্টে, নইলে এবারও তার মাথাটা ফুটতো।

শাশুড়ী কিন্তু তাকে রেহাই দিলে না। বললে, এত বড় বাড় হয়েছে তোর হতভাগী, তুই ছেলে কেড়ে নিবি আমার কোল থেকে ?

বলেই সে তেড়ে নেমে এলো উঠোনে। এসেই তার লম্বা হাতটা বাড়িয়ে তারই ফেলে-দেওয়া চ্যালা কাঠটা তুলে নিয়ে মেয়েটাকে মারতে উঠলো।

নবীন একবার তাকালে সতীশের দিকে। দেখলে, সে নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে শুধু। মুখ দিয়ে একটা কথা পর্যন্ত বেরুচ্ছে না।

নবীন বললে, কি হচ্ছে এ-সব ?

কিন্তু কাকেই-বা বলছে, আর কেই-বা শুনছে !

সতীশের স্ত্রীর লজ্জা-শরম-ভয়-ভাবনার বালাই নেই। কোলের ছেলেটা প্রাণপণে চীৎকার করছে, ছোট মেয়ে উমা এসে দাঁড়িয়েছে দোরের কাছে, আর একটা মেয়ে যেন উঁকিঝুঁকি মারছে তার পেছনে।

উমা বলছে, মা চলে এসো। বাবু দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে।

সতীশের স্ত্রীর সেদিকে কান দিতে গেলে চলে না। সে তখন বৌটাকে মেরে তাড়াবার জন্য ব্যস্ত। মাথার ওপর হাত দুটো আড়াল করে বৌটা যত পিছু হাঁটছে, সতীশের স্ত্রী ততই তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে এগিয়ে আসছে।

শেষে একসময় মরিয়া হয়ে বৌ রুখে দাঁড়ালো। কাঁদতে কাঁদতে বললে, মারুন আপনি আমাকে। মার খেয়ে যদি আমাকে মরেও যেতে হয় তবু আমি ছেলে না নিয়ে এখান থেকে নড়ব না।

সতীশের স্ত্রী চীৎকার করে উঠলো, তবে রে হতভাগী!

বলেই সে তার হাতের কাঠটা সজোরে বসিয়ে দিতে গেল বৌ-এর মাথায়।

বসালে কি হতো বলা যায় না। কিন্তু সে-অবসর সে পেলে না। মুহূর্তের মধ্যে নবীন ছুটে গিয়ে তার হাত থেকে কাঠখানা কেড়ে নিলে।

কেড়ে নিয়েই চীৎকার করে উঠলো, এ কী করছেন আপনি? দিন—ওর ছেলে ওকে ফিরিয়ে দিন।

কিন্তু আশ্চর্য মেয়ে এই সতীশের গৃহিণী! নবীন অবাক হয়ে গেল তার ব্যবহার দেখে। ছেলে তো ফিরিয়ে দিলই না, এমন কি নিতান্ত নির্লজ্জের মত তাদের অন্নদাতা এই জমিদারপুত্রের আদেশ অগ্রাহ্য করে ছেলেটাকে তেমনি কোলে নিয়েই তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভেতর ঢুকে হড়াম্ করে তাদের মুখের ওপরেই দোরটা দিলে বন্ধ করে।

নিতান্ত অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো বেচারা সতীশ। নির্বাক দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা তার পক্ষে আর সম্ভব হলো না। ছুটে গিয়ে দোরের কাছে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়লো।—'খোলো, দরজা খোলো! ছি, ছি, ছি, ছি, আমার মান-সম্মান কিছুই আর রাখলে না তুমি!'

নবীনের সারা অন্তর তখন বিতৃষ্ণায় ভরে গেছে। এই কি মানুষের জীবন? তবু এই জীবনকে আঁকড়ে ধরে দিনের পর দিন এরা অতিবাহিত করছে। কিসের আশায় কিসের আনন্দে এরা বেঁচে আছে কে জানে!

বড় বৌ-এর উপর এত রাগই-বা কিসের, কেনই-বা তার ওই কচি ছেলেটাকে এরা কেড়ে নিতে চায়—কিছুই ভাল বুঝতে পারলে না নবীন।

থাক্, আর বুঝেও কাজ নেই।

'মর তোমরা। যা খুশি তাই কর।'

নবীন তার বন্দুকটি তুলে নিয়ে সদরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। পেছনে ডাক শুনে আবার তাকে থামতে হলো।

কান্নাকাতর নারীকণ্ঠের ব্যাকুল আহ্বান।—'শুনুন!'

নবীন দেখলে, সতীশের সেই নির্যাতিতা বড় বৌ আলুথালু বেশে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

এত ভাল করে মেয়েটিকে সে এর আগে দেখেনি। সারা অঙ্গে তার পরিপূর্ণ যৌবন। মাথার এলো খোঁপাটা খুলে গেছে, বুকের কাপড় গেছে আল্‌গা হয়ে, কপালের রক্তটা হাত দিয়ে মুছতে গিয়ে চোখের জলে আর সিঁথির সিঁদুরে মিলে মিশে সে এক অদ্ভুত রকমের দেখাচ্ছে তার সুন্দর মুখখানি। বড় বড় দুটি চোখ বেয়ে অশ্রুর ধারা নেমে আসছে দর্ দর্ করে। নীচেকার ঠোঁটটি থর্ থর্ করে কাঁপছে।

মুখ ফুটে কিছুই সে বলতে পারলে না। বলবার প্রয়োজনও ছিল না। সন্তানহারা মাতার নিরুদ্ধ বেদনার ছাপ ছিল তার সারা মুখে আঁকা। নবীন বুঝতে পারলে অসহায়া মেয়েটি তার সাহায্য চায়।

'কিন্তু কী আমি করতে পারি বল!'

মেয়েটি কি বলবে কিছুই বুঝতে পারছিল না। হাত দিয়ে

শাড়ীর আঁচলটা তুলে নিয়ে চোখের জলটা মুছতে মুছতে বললে, আপনি যাবেন না। আপনি চলে গেলে—

কথাটা সে শেষ করতে পারলে না। আবার যেন কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো।

কথাটা শেষ করে দিলে পশুপতি। দেখা গেল, এতক্ষণ পরে সে তার গাছের তলার নিরাপদ আশ্রয়টি পরিত্যাগ করে নবীনের কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে, সেকথা সত্যি। আপনি চলে গেলে এই মেয়েটার 'নতিজা'র আর কিছু বাকি থাকবে না।

নবীন বললে, আমি থাকলেই বা কি হচ্ছে? আমার কথা শুনছে কে?

পশুপতি বললে, ওর বাপ্ শুনবে।

এই বলে সে তার বন্দুকটি হাত থেকে এক রকম কেড়ে নিয়ে বললে, আসুন।

—কোথায় যাব?

পশুপতি হাসলে। বললে, আপনার কাছারি মানে আপনারই বাড়ী। দোতলায় আপনাদের চমৎকার সাজানো ঘর রয়েছে। ওদিকে স্নানের ঘর, টিউবওয়েল্, রান্নার জায়গা, আর আপনি বলছেন কোথায় যাব?

এই বলে সিঁড়ি দিয়ে উঠে পশুপতি তাকে দোতলার ঘরে নিয়ে গিয়ে বললে, এখানে আপনি কি এই প্রথম আসছেন?

নবীন বললে, না, প্রথম নয়। এসেছি, কিন্তু এখানে থাকিনি কোনোদিন।

—থাকুন কয়েকটা দিন। মন্দ লাগবে না। জায়গাটা ভাল।

এখানে কয়েকটা দিন থাকবার কথা নবীন কল্পনাও করতে পারে না। এখানে এসেছে সে মাত্র ঘণ্টাখানেক, এরই মধ্যে যে-সব কাণ্ড হয়ে গেল, তা' ভাবতেও কষ্ট হয়। বললে, বেশ আছেন আপনারা!

—আমাকে আর 'আপনি' বলছেন কেন ?

বলতে বলতে পশুপতি বসলো একটা চেয়ার টেনে নিয়ে।

বললে, কেন ? মন্দই-বা কি আছি ? বলেই সে তার হাত দুটি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে তার শাশুড়ী-ঠাকরুণের উদ্দেশে একটি প্রণাম করলে। প্রণাম করে বললে, মাগো করালবদনা ! আমাকে উনি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। দেখলেন না, কি রকম চুপ করে ছিলাম ! ভয়ে একটা কথাও বলিনি।—চ্যালা কাঠটা আপনি ওঁর হাত থেকে কেড়ে নিলেন যখন, আমার তো তখন রীতিমত প্যাল্‌পিটেশন্ হচ্ছে। ভাবলুম, কাঠটা দেয় বুঝি বসিয়ে আপনার মাথায় !

এই বলে সে তার দন্তহীন মুখে বড় চমৎকার হাসি হাসতে লাগলো।

হাসিটা কিন্তু নবীনের ভাল লাগলো না। এইমাত্র যে-ঘটনা ঘটে গেল, তার পরেও এই মানুষটি হাসে কেমন করে ?

সেদিক থেকে মুখটা ফিরিয়ে নিতেই নবীনের চোখে পড়লো—সতীশের বৌমা দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির কাছটিতে। সেও বোধ করি তাদের পিছু পিছু ওপরে উঠে এসেছে। বিষণ্ণ ম্লান মুখে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে সতীশের বাড়ীটার দিকে। সেখানে তার ছেলেটা বোধ করি এখনও কাঁদছে।

নবীন বললে, আচ্ছা বলুন তো পশুপতিবাবু, সতীশের বড় বৌমার ব্যাপারটা কি ?

পশুপতি বললে, আমার বড় শালা ফকিরকে আপনি দেখেছেন ?

—না।

—সেই ফকির কলকাতায় কাজকর্ম করে। মাসে মাসে বাপকে তিরিশ-চল্লিশ টাকা পাঠায়। লায়েক ছেলে। সেই ছেলের বিয়ে হলো এই পাশের গ্রামে। বৌটি দেখতে-শুনতে ভাল। ওই তো

দেখতেই পাচ্ছেন মেয়েটিকে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার মশাই, বিয়ের পর থেকেই দেখি স্বামী-স্ত্রীতে খিটির-মিটির লেগেই আছে। দেখতে দেখতে ছেলে হলো একটি। ওই তো দেখলেন কেমন সুন্দর রাজপুত্রের মতন ছেলে। ভাবলাম, ছেলে হয়েছে, এবার ওদের ঝগড়াঝাঁটি সব মিটে যাবে। কিন্তু সর্বনাশ! ঝগড়াঝাঁটি তো মিটলোই না, উল্‌টে দেখলাম, ফকির একদিন একটি কালোকুলো ডাগর-ডোগর মেয়ে নিয়ে এসে হাজির হলো। মেয়েটির সিঁথিতে সিঁদুর, মাথায় ঘোম্‌টা, বললে, আমি আবার বিয়ে করেছি। এই আমার বৌ। গাঁয়ের লোক ছি ছি করতে লাগলো, কিন্তু বাপ-মা কিছু বললে না। রোজগেরে ছেলে—যা করেছে ভালই করেছে। শ্বশুরমশাই আপনাদের জমিদারীতে অনেকদিন নায়েবী করে করে মাথাটা পাকিয়েছেন ভাল করে। তাই তিনি বলতে লাগলেন, বৌমার বাবা দশ বিঘে জমি দেবো বলেছিল, দিচ্ছি দেবো বলে দিলে না কিছুতেই, তাই ছেলে আমার বিয়ে করেছে। এদিকে আমার শাশুড়ী-ঠাকরুণ ধরে বসলেন, দুটো বৌ একসঙ্গে রাখা চলবে না। ছোট লোকের মতন ঝগড়াঝাঁটি উনি ভালবাসেন না। কাজেই তাড়াও বড় বৌকে। সমস্যা হলো ছেলে নিয়ে। শ্বশুরমশাই বললেন, ছেলে নিয়েই ও চলে যাক্। ছেলে রাখার ঝামেলা অনেক। তাছাড়া, ছোট বৌ-এর ছেলে হতেই-বা কতক্ষণ! কিন্তু মা আমার মুণ্ডমালিনী বিকট দশনা। বললেন, কভি নেহি। ছেলে আমাদের। ও একাই যাক্। এই তো ব্যাপার। এই নিয়ে সকাল বেলা একচোট্ হয়ে গেছে দুই স্বামী-স্ত্রীতে আপনি আসবার ঠিক আগেই। মায়ের আমার ওই এক টেক্‌নিক্! ভীমা ভবানী মা আমার—

বলেই পশুপতি আবার তার হাত দুটি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে মাকে বারম্বার নমস্কার করতে করতে বললে, মা! মা!

তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট। মাগো! নেচে নেচে আয় মা, নেচে নেচে আয়!

নবীন অতি কষ্টে হাসি সম্বরণ করলে। বললে, বুঝলাম। এখন উপায়?

পশুপতি বললে, উপায় আপনারই হাতে।

—কি রকম?

পশুপতি একবার বাইরে তাকিয়ে দেখে নিলে, তারপর গলাটা একটু খাটো করে বললে, আপনার জমিদারী তো লাটে উঠছে।

—তাই তো শুনছি।

পশুপতি বললে, এইবার বলে দিন—"সতীশ, তোমার চাকরি খতম্। এই বাড়ী তুমি সাত দিনের ভেতর ছেড়ে দাও।"

নবীন বললে, তাতে ওই মেয়েটার কি লাভ?

পশুপতি বললে, দাঁড়ান, আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। শুনছি নাকি একটা আইন পাশ হয়েছে—এক স্ত্রী বেঁচে থাকতে কেউ নাকি আর-একটা বিয়ে করতে পারবে না?

—হ্যাঁ, হবে।

পশুপতি বললে, কেউ কোনও খবর রাখে না। হবে নয়, বলুন হয়েছে। বলুন, বৌটাকে আপনি আদালতে নিয়ে যাবেন।

নবীন বললে, তার পর?

—ছেলের বাপ্ মানে আমার শ্বশুর তখন আপনার পায়ে ধরবে। আপনি বলবেন, তাহ'লে বড় বৌকে তার ছেলে ফিরিয়ে দাও। দিয়ে এইখানে রাখ।

নবীন বললে, ওই শাশুড়ী আর ওই সতীনের সংসারে কি সুখে থাকবে?

পশুপতি বড় অদ্ভুত হাসি হাসলে নবীনের মুখের দিকে তাকিয়ে। বললে, মেয়েদের চেনেন না আপনি।

নবীন বললে, কি জানি মশাই। হয়ত-বা সত্যিই চিনি না।

আচ্ছা ও-কথা থাক্। আপনাকেও তো সতীশ বলে দিয়েছে আদালতে যেতে। আপনি কি করবেন? যাবেন আদালতে?

পশুপতি বললে, ক্ষেপেছেন নাকি? আমি কোন্ দুঃখে আদালতে যাব?

—না গেলে সতীশ তো ওর মেয়েকে পাঠাবে না আপনার বাড়ীতে!

পশুপতি বললে, ওর বাপ্ পাঠাবে।

—কিন্তু আমার তো তা' মনে হয় না।

পশুপতি আবার তার গলার আওয়াজটা খাটো করে নিলে। নিয়ে বললে, তাহ'লে শুনুন। আপনার এই গোমস্তাটি আমাকে অমনি মেয়ে দেয়নি, বিয়ের আগে নগদ পাঁচশো টাকা গুনে গুনে দিয়েছি ওর হাতে। এবারেও এনেছি শ' দুয়েক। দেবো যেদিন, নিজে সঙ্গে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে মেয়েকে।

নবীন বললে, না না, তাহ'লে সতীশ ও-রকম কথা বললে কেন?

—আমার কাছ থেকে কিছু আদায় করবার জন্যে।

নবীন বললে, তা আপনিই-বা ওর মেয়েটাকে অত খাটান কেন? পয়সাকড়ি আছে আপনার, লোকজন রাখলেই তো পারেন!

পশুপতি আবার হাসলে। বললে, আপনি সত্যিই ছেলেমানুষ! মেয়েটা সারা দিনরাত কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে, গজর্ গজর্ করে, আমাকে গালাগালি দেয়—কোনো কিছু ভাববার অবসরই পায় না। আর তা' যদি না করে ধরুন, আমি গোটা দুই লোক রেখে দিলাম, ওকে কাজকর্ম কিছু করতে হলো না, পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে বসে শুধু খাওয়া আর শোওয়া! ভেবে দেখুন তাহ'লে ও কি করবে। এখন বুঝেছেন তো?

সতীশ এলো এতক্ষণ পরে। বৌ দাঁড়িয়েছিল সিঁড়ির পাশে।

সেদিকে সে না তাকিয়েই একেবারে সোজা চলে এলো নবীনের কাছে। বললে, নিন, এবারে চান-টান করুন।

বলেই সে তাকালো পশুপতির দিকে। বললে, তুমি এতক্ষণ বসে বসে বুঝি আমার সম্বন্ধে লাগাচ্ছো বাবুকে?

পশুপতি উঠে দাঁড়ালো। বললে, লাগাবার যা কিছু আপনি লাগিয়েই রেখেছেন, আমি বসে বসে শুধু ছাড়ালাম।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, দরজা খুলেছে?

সতীশ বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। দেখলেন তো বাবু! এই আগুনে আমি দিনরাত জ্বলছি।

নবীন বললে, ও আগুন তুমি নিজেই জ্বালিয়েছ।

—না বাবু, সাধ করে এ আগুন কেউ জ্বালায় না। এই আমার

নবীন বললে, না। এই তোমার চরিত্র। যাকৃগে, ও-সব বুঝবার দরকার নেই। তোমার ছেলে কবে আসবে বল।

সতীশ বললে, কাল শনিবার। কাল আসবে।

নবীন বললে, কাল পর্যন্ত আমি এইখানে রইলাম তাহ'লে। তোমার ছেলে এলে তোমার বড় বৌ সম্বন্ধে একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিয়ে তার পর আমি যাব।

সতীশ বললে, সেই ভাল বাবু, দেখুন আমার ছেলেকে। খুব ভাল ছেলে। আজকালকার দিনে যেমনটি হওয়া উচিত, ঠিক তেমনি। আপনাদের সঙ্গে মিলবে ভাল।

বড় বৌ কখন যে দরজার কাছে এগিয়ে এসেছে কেউ জানতে পারেনি। বললে, আমি তাহ'লে কাছারির উনোনে আগুন দিই?

সতীশ বলে উঠলো, নিন, শুনুন মেয়ের কথা! আবার একটা নতুন হাঙ্গামা বাধাতে চাচ্ছে। তুমি বুঝি ওদের হাতে খাবে না?

বৌ বললে, না বাবা, আমার জন্যে বলিনি।

বড় বড় চোখ ছুটি একবার নবীনের দিকে তুলে বললে, বলছি ওঁর জন্যে।

কথাটা সতীশ এতক্ষণে বুঝতে পারলে।—তা' মন্দ বলেনি কথাটা। বললে, এ-বেলা ওরা রান্না করে ফেলেছে। ও-বেলা থেকে তাই কোরো।

বড় বৌ বললে, কাছারির কোটালকে আপনি একবার ডেকে পাঠান। খিড়কির পুকুরে মাছ ধরাতে হবে।

সতীশ বলে উঠলো, কেন, মাংস ?

বড় বৌ বললে, সেটা কাল হবে।

পশুপতি বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। বললে, বৌ-ঠাকরুণ আমাদের রাঁধে ভাল। তাহ'লে আমিও এইখানেই চারটি প্রসাদ পাব।

বড় বৌ ঘাড় নাড়লে। বললে, আজ্ঞে না। প্রসাদের অগ্রাধিকার যে রান্না করে—তার। তার পর অন্য লোকের।

সতীশ তার কথা শুনে দপ্ করে যেন জ্বলে উঠলো। বললে, ছাখো বৌমা, তোমার ওই ন্যাকা-ন্যাকা বড় বড় কথাগুলো শুনলে গা জ্বালা করে।

পশুপতি বললে, তা সে জ্বালা একটু সহ্য করতে হবে বই-কি ! লেখাপড়া-জানা মেয়ে যখন ঘরে আনলেন তখন ভাবলেই পারতেন —ওর কথাগুলো একটু অন্যরকম হবে।

সতীশ বললে, শুনুন বাবু, কথা শুনুন পশুপতির। বলি আমার ছেলে ফকিরও তো তোমার মতন মুখ্খু নয়, বৌ একটু লেখাপড়া না জানলে তার সঙ্গে মনের মিল হবে কেন ?

পশুপতি বললে, তা সত্যি। এতক্ষণ পরে আপনি একটা কথার মত কথা বলেছেন। ছেলে-বৌএ মনের মিল যা হয়েছে তা উনি নিজের চোখেই খানিকটা দেখতে পাচ্ছেন। ছু' একদিন থাকুন, থাকলে আরও ভাল করে দেখবেন।

সতীশ তার জামাইকে এক ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিলে।—'তুমি থামো! মুখ্খু কোথাকার!'

এই বলে সে উঠলো। বললে, উঠুন আপনি। চানের ঘরে চলে যান। আমি কোটালকে ডাকি।

সতীশ চলে যেতেই নবীন ডাকলে, বৌমা!

বৌমা দোরের বাইরে এসে দাঁড়ালো। বললে, বৌমা নয়। আমার নাম সুধা।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কতদূর পড়েছ?

লজ্জায় মাথাটা নামিয়ে নিলে সুধা। বললে, কিছু না। বলেই সে সরে গেল সেখান থেকে।

পশুপতি এগিয়ে এলো। বললে, ওদের গাঁয়ে মেয়েদের একটি ইস্কুল আছে। সেইখান থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। বাপ গরীব, তাই আর পড়াতে পারেনি। বিয়ে দিয়ে দিয়েছে।

—সতীশের ছেলে কতদূর পড়াশোনা করেছে?

পশুপতি বললে, কি জানি মশাই, জিজ্ঞাসা করলে বলে না। আমার যখন বিয়ে হলো, লেখাপড়া ও তখন শেষ করে দিয়েছে।

নবীন বললে, সুধা জানে না?

দোরের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল সুধা। মুখ বাড়িয়ে সোজা নবীনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, ও-সব জেনে কি হবে আপনার? কাল আসবে, তখন সব বুঝতে পারবেন। নিন উঠুন। বেলা হয়েছে।

এই বলে সত্যিই সে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে চলে গেল।

নবীন বললে, মেয়েটার অদৃষ্ট।

পশুপতি বললে, এর বেলা অদৃষ্ট বললেন, আর আমার শ্বশুরকে বললেন, চরিত্র। মানুষের চরিত্র আর মানুষের অদৃষ্ট—এ-দুটোই কি এক নাকি?

নবীন বললে, ঠিক বুঝতে পারি না। তবে এক একসময় আমার মনে হয় যেন দুটোই এক।

এদের এই বিশ্রী হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়বার ইচ্ছা নবীনের ছিল না। না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু অদ্ভুত মানুষের মন। তার হদিশ পাওয়া শক্ত। বাইরের লোকের পক্ষে তো বটেই, এমনকি সেই মনের যিনি মালিক—তার কাছেও।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার আগে পর্যন্ত নবীন ঠিক করতে পারেনি—কি সে করবে। স্নান করে নীচের রান্নাঘরে বসেই সে খেয়েছিল। পরিপাটি করে আসন বিছিয়ে বসে বসে খাইয়েছিল সতীশের মেয়ে—উমা।

সে এক অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়ে। কথা বলে আর হাসে। গায়ের রং ময়লা, কিন্তু তার স্বাস্থ্য, তার যৌবন, তার হাসি—সব-কিছু মিলিয়ে এমন একটা আকর্ষনী শক্তি তার আছে—যা দেখলে খুব খারাপ লাগে না।

নবীনের ধারণা ছিল অন্যরকম। ভেবেছিল, পশুপতির মত বুড়ো স্বামী যার—সে বোধ করি তার এই দুর্ভাগ্যের চিন্তাতেই দিবারাত্রি ম্রিয়মান হয়ে থাকবে, কিন্তু মেয়েটার আচারে-ব্যবহারে কথায়-বার্তায় তার কোনও চিহ্নই সে দেখতে পেলে না।

তালপাতার একটা পাখা হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ালো উমা। খাবারের থালায় যাতে মাছি না বসে তার জন্যে ধীরে ধীরে হাওয়া করতে করতে হেসে বললে, বলেন তো চলে যাই। কি জানি বাবা, লজ্জা করে যদি না খান্।

খেতে খেতে নবীন মুখ তুলে তাকালে। হাসলে মেয়েটার গালে দুটো টোল্ পড়ে। নেহাৎ মন্দ দেখায় না।

নবীন কোন কথাই বললে না।

উমা আবার বললে, যাব, না থাকবো ?

নবীন বললে, থাকো।

—লজ্জা করে না-খাওয়া হবেন না তো ?

—'না।' নবীন জিজ্ঞাসা করলে, এ-সব কে রাঁধলে ? তুমি ?

মাথা নেড়ে উমা বললে, না। এত ভাল রান্না আমি করতে পারি না। আমার আর একটা বৌদিদি আছে—বাঙ্গাল বৌদিদি। রান্না-বান্নায় সে একেবারে ওস্তাদ।

এই সুযোগে নবীন একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার লোভ কিছুতেই সম্বরণ করতে পারলে না। জিজ্ঞাসা করলে, তোমার আগের বৌদিদিটার পেছনে তোমরা এত লাগো কেন ?

উমা আবার হাসলে। বললে, ছুটো বৌ ? বাবাঃ। একটাই সামলাতে পারে না! ছুটো।

নবীন বললে, সেজন্যে তো দায়ী তোমার দাদা।

উমা এড়িয়ে গেল কথাটা। বললে, কি জানি বাবা। আমার অতসব জানবার দরকার নেই।

নবীন কিছুক্ষণ চুপচাপ খেতে লাগলো। কিন্তু আর একটা কথা তাকে জিজ্ঞাসা করতেই হবে। বললে, তোমার শ্বশুরবাড়ী কেমন ?

কথা বলবার আগে উমা চোখ তুলে তাকালে নবীনের দিকে। মুখ টিপে একটু হাসলে। হেসে বললে, সে কথা জেনে আপনার লাভ কি ?

—লাভ-লোকসান জানি না। এমনি জিজ্ঞাসা করছি।

—যদি না বলি!

নবীন বললে, বোলো না।

উমা হঠাৎ খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো। নবীন জিজ্ঞাসা করলে, হাসছো কেন ?

—আমি জানি কেন আপনি ওকথা জিজ্ঞাসা করছেন।

—কেন বল তো ?

উমা কেমন যেন অদ্ভুত এক মুখ ভঙ্গী করে বললে, জানি না, যান !

—বারে। এক্ষুনি বললে জানি, আবার বলছো জানি না। বেশ মেয়ে তো ! যাও, তোমার সঙ্গে আর কথা বলব না।

উমা তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, বলছি, বলছি।

এই বলে সে তার মুখখানা নবীনের কানের কাছে নিয়ে গিয়ে চুপিচুপি বললে, আমার বর বুড়ো কিনা—তাই।

নবীন বললে, হ্যাঁ তাই। আমিও সেই জন্যেই জিজ্ঞাসা করছি। তুমি বেশ সুখে আছ ?

উমা টেনে টেনে বললে, হ্যাঁ—।

নবীন বললে, মিছে কথা।

উমা বললে, মিছে কথা কেন হবে ? ওর যে টাকা আছে।

—টাকা থাকলেই সুখী হয় ?

উমার হাতের পাখা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। নবীনের মুখের দিকে আবার সে তাকালে। মুখ টিপে আবার একবার হাসলে। হেসে বললে, যান্ !

বলেই মাথা হেঁট করে আবার তার হাতের পাখাটা ধীরে ধীরে নাড়তে লাগলো।

নবীনও কিছুক্ষণ কোনও কথা বলতে পারলে না। উমাও মুখ তুলে তাকালে না।

সুমুখের দোরের কাছে খুট্ করে একটা আওয়াজ হলো। চম্‌কে উঠলো উমা। চুপিচুপি বললে, দেখেছেন আমার কত সুখ ?

কথাটা সে কেন বললে নবীন প্রথমে বুঝতে পারেনি। কিন্তু সুমুখে তাকাতেই দেখলে, হুঁকো হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকছে পশুপতি।

বাঁহাত দিয়ে শাড়ীর আঁচলটা উমা তার মাথায় তুলে দিয়ে বললে, আমি চললাম।

এই বলে সে পাখাটা ঠক্ করে সেইখানে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালো।

পশুপতি বললে, আহা উঠলে কেন ?

উমা কট্‌মট্ করে তার দিকে তাকিয়ে বললে, না, উঠবে না! এখানেও আগলাতে এলে ?

তারপর নবীনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, আপনি জিজ্ঞাসা করুন তো ওকে—ও কেন আমাকে চব্বিশঘন্টা আগ্‌লে আগ্‌লে বেড়ায় ?

নবীনকে কোনও কথাই বলতে হলো না। পশুপতি কাঠের চেয়ারটার ওপর ভাল করে চেপে বসলো। তারপর হুঁকো টানতে টানতে ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগলো।

উমা বললে, ওই হাসি দেখলে আমার গা জ্বালা করে! বেশ, তাহ'লে হাসো বসে বসে, আমি চললাম।

উমা বোধ হয় রাগ করেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

খাওয়াদাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করবার জন্যই নবীন তার দোতলার ঘরে এসে শুয়ে পড়েছিল বড় ইজি চেয়ারটার ওপর। চোখ বুজে বোধ করি ভাবছিল সতীশের এই বিচিত্র সংসারটির কথা। ভাবতে ভাবতে কোন্ সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ কিসের একটা শব্দে যেন তার ঘুম ভেঙে গেল।

চোখ চেয়ে তাকাতেই দেখে, ছোট একটা বছর খানেকের ছেলে তার একটা পা জড়িয়ে ধরে 'তা' 'তা' বলে চেঁচাচ্ছে, আর তার গায়ের ওপর ওঠবার চেষ্টা করছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসে ছেলেটাকে সে দু'হাত দিয়ে তুলে নিলে বুকের ওপর। জিজ্ঞাসা করলে, কি নাম তোমার ?

ছেলে কি তার নাম বলবে? না জবাব দেবে? নবীন সে কথা জানে। জেনেশুনেই বলেছিল—তার প্রমাণ পাওয়া গেল একটুখানি পরে। ফুলের মত সুধার সেই সুন্দর মুখখানি দোরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো। দেখা গেল সে স্নান করে কপালের রক্তের দাগটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করেছে, মাথার চুলটা আঁচড়েছে, পরিষ্কার একটি খাটো জামা পরেছে, শাড়ী পরেছে। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে।

সুধার আগেকার সে ছবিটাও কিন্তু নবীনের মন থেকে মুছে যায়নি। মাথার চুলগুলো উস্‌কো-খুস্‌কো, খাটো দু'চার গাছি কালো চুল তার কপালে এসে পড়েছে। তারই নীচে সরু একটি রক্তের দাগ—চোখের ওপর পর্যন্ত নেমে এসেছে কপাল থেকে। হাত দিয়ে সেটাকে মুছতে গিয়ে সাদা গায়ের চামড়ার ওপর লাল রক্তের দাগটা আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিষণ্ণ সেই ম্লান মুখখানি নবীনের যেন আরও ভাল লেগেছিল।

এ-মেয়েটাকে এদের এ সংসারে মানায় না।

—কি নাম রেখেছ ছেলের? নবীন জিজ্ঞাসা করলে ছেলের মাকে।

ছেলের মা জবাব দিলে, আমি শুধু খোকা বলে ডাকি। এরা নাম রেখেছে কার্ত্তিক।

বলেই সে মুখ টিপে একটু হাসলে।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, হাসছো যে?

সুধা বললে, ওর ভাল একটা নাম আমি রেখেছি। কিন্তু সে-নামটা আমি কারও কাছে বলি না।

—কি সে নাম? আমার কাছে বলতে আপত্তি আছে?

সুধা বললে, না।

বলেই সে একেবারে নবীনের কাছে এসে দাঁড়ালো। হাত বাড়িয়ে ছেলেটাকে নবীনের কোল থেকে তুলে নিয়ে বললে, 'অনাহূত।'

নবীন প্রথমে ভাল বুঝতে পারেনি। জিজ্ঞাসা করলে, কি বললে? অনাহূত? তার মানে?

সুধা বললে, unwanted.

কথাটা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল নবীন। মেয়েটা বলে কি? এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলো সে তার মুখের দিকে। কিছুতেই আর চোখ ফেরাতে পারলে না।

সুধা সেটা লক্ষ্য করলে। তারও ইচ্ছে করছিল তাকাতে। কিন্তু যতবার তাকায়, ততবারই লজ্জায় সে চোখ নামিয়ে নেয়। শেষে একসময় ফট্ করে জিজ্ঞাসা করে বসলো, কি দেখছেন?

—কিছু না। তোমার মুখে যে হাসি দেখবো তা আমি বিশ্বাস করিনি।

সুধা কোনও জবাব দিলে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

নবীন আবার বললে, তাহ'লে কি ঠিক করলে তুমি? ছেলেকে নিয়ে চলে যাবে এখান থেকে?

সুধা একটু এগিয়ে এলো। গলাটা একটু খাটো করে বললে, সেই কথাই ভেবেছিলাম। কিন্তু আজ আমার মনের অবস্থা গেছে একেবারে বদলে। ছেলেটাকে আমি নিয়ে যাব না, ছেলেটা থাকবে এইখানে।

কথাটা শুনে নবীনের বিস্ময়ের আর সীমা রইলো না। বললে, সে কী কথা! তোমার শাশুড়ী তো এইটিই চেয়েছিলেন। আগে যদি তুমি এই কথা বলতে, তাহ'লে তো এত ঝগড়াঝাঁটি, এত মারামারি—কিছুই হতো না।

সুধা বললে, জানি।

বলেই সে তার চোখদুটি বন্ধ করে কি যেন ভাবলে। ভেবে বললে, তখন মনে হয়েছিল, ছেলেটাকে ছেড়ে কি নিয়ে আমি জীবন কাটাবো? এখন মনে হচ্ছে যাদের ছেলে—ওকে আমি তাদের কাছেই দিয়ে যাব। ভালই থাকবে। শাশুড়ী একে খুব ভালবাসে।

নবীন বললে, ও না হয় ভালই থাকবে, কিন্তু তুমি ?

—আমি ?

ম্লান একটুখানি হেসে সুধা বললে, আমার কথা কে আর ভাবছে বলুন !

নবীন মুখ তুলে তাকালে সুধার মুখের দিকে। চোখে চোখ পড়লো। মানুষ মুখে যা বলতে পারে না, অনেক সময় চোখ সেকথা বলে দেয়। কেমন যেন একটা অভূতপূর্ব শিহরণ জাগলো নবীনের সারা দেহে। চট্ করে মুখ দিয়ে তার কথা বেরুচ্ছিল না, তবু যেন সে জোর করে বললে, যদি বলি—আমি ভাবছি।

হঠাৎ কেমন যেন অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল হয়ে উঠলো সুধার চোখদুটি। বললে, সত্যি ?

—হ্যাঁ, সত্যি।

ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছিল মায়ের কোলে। সুধা বললে, খোকাকে আপনার এই খাটের ওপর শুইয়ে দিই। ভয় নেই আপনার, আমি এক্ষুনি চলে যাব।

সুধার দিক থেকে নবীন কিছুতেই যেন তার চোখ ফেরাতে পারছিল না। সকালে যে-মেয়েটিকে দেখেছিল এ যেন সে-মেয়ে নয়।

ছেলেটাকে শুইয়ে রেখে সুধা তার কাছে এসে বসে পড়লো মেঝের ওপর। বসে পড়লো একেবারে তার পায়ের কাছে। বসবার সে এক অপরূপ ভঙ্গী !

নবীনের মুখের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে বড় সুন্দর হাসি হাসলে। পরিচ্ছন্ন বেশবাস, নিটোল সুগঠিত স্বাস্থ্য, কানে দুটি সাদা পাথর আর দুহাতে দু'গাছা সোনার চুড়ি ছাড়া সারা দেহে সোনার এতটুকু চিহ্ন কোথাও নেই।

সুধা বললে, আপনি কি ভাবছেন আমি বুঝতে পেরেছি।

—না, কিছু বুঝতে পারনি। নবীন বললে।

বললে, কই বল তো দেখি কি ভাবছি।

—ভাবছেন, এ কি রকম মেয়ে রে বাবা! আজ সকালে যে-ছেলেকে নিয়ে এত কাণ্ড হয়ে গেল, এখন বলছে সেই ছেলেকে ফেলে দিয়ে চলে যাব। এ কি রকম রাক্ষসী মা? এই তো?

নবীন বললে, না। মানুষের মনের কথা বলা অত সহজ নয়।

—তাহ'লে হেরে গেলাম।

এই বলে হাসতে হাসতে সুধা উঠলো।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, চলে যাচ্ছ নাকি?

সুধা খাট থেকে খোকাকে কোলে তুলতে তুলতে বললে, যেতেই যখন হবে তখন চলেই যাই।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে নবীনের দিকে তাকিয়ে বললে, যেকথা আপনি ভাবছেন—সেকথা আমি ইচ্ছে করেই বললাম না।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, কেন?

—শুনলে আপনি লজ্জায় মরে যাবেন।

নবীন আর বসে থাকতে পারলে না। উঠে দাঁড়ালো। ডাকলে, সুধা!

সুধা একবার ফিরেও তাকালে না। ছেলে কোলে নিয়ে সোজা সিঁড়ির দিকে চলে গেল। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়েছিল পশুপতি। হাসতে হাসতে বললে, প্রেমালাপ হচ্ছিল নাকি?

সুধা বললে, হ্যাঁ।

—তা চলে যাচ্ছ যে?

সুধা বললে, আপনার ভয়ে।

জামা গায়ে দিচ্ছিল নবীন।

পশুপতি জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কি কোথাও বেরোবেন নাকি?

নবীন বললে, হ্যাঁ, পোষ্টাপিসে যাব। থাকতেই যদি হয় তো মাকে একখানা চিঠি লিখে দিয়ে আসি। নইলে মা ভাববে।

—সে বয়েস আপনার পেরিয়ে গেছে। এখন আর মা ভাববে না। নিন, চা খান।

বলতে বলতে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলো সুধা।

পশুপতি টিপ্পনি কাটতে ছাড়লে না। বললে, বা, বেশ খুশী খুশী ভাব দেখছি যে! কি হলো তোমার?

সুধা বললে, আনন্দ। সত্যি বলছি দাদা, আজ আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।

পশুপতি বললে, শাশুড়ীর হাতে মার খেয়ে যে আনন্দ হয়—সে তো আমি এই প্রথম শুনছি।

—তাহ'লে আর একটা কথা আজ প্রথম শুনে রাখুন। সুধা বললে, কোনও একটি বিশেষ কারণে মানুষের মনের অবস্থা এমনও হতে পারে—তখন শাশুড়ীর মার তো দূরের কথা, পৃথিবীর কোনও মারই তার গায়ে লাগে না।

মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসতে হাসতে পশুপতি মিট্‌ মিট্‌ করে তাকাচ্ছিল সুধার দিকে। এই মেয়েটির মুখে এরকম কথা সে কোনোদিনই শোনেনি। বিয়ের পর থেকে দেখে আসছে, শিক্ষিতা স্বাস্থ্যবতী এই মেয়েটি তার আগুনের মত রূপ নিয়ে, মুখ বুজে এ-বাড়ীর সব রকমের অত্যাচার সহ্য করছে। প্রকাশ্যে কোনদিন বিদ্রোহ করেনি, নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়নি, কী যে তার মনের কথা কোনোদিন কেউ বুঝতেও পারেনি। আজ এমন কী কারণ ঘটলো যার জন্য তার এই রূপান্তর,—পশুপতি কিছুতেই বুঝতে পারছিল না। কারণের মধ্যে একটি মাত্র কারণ সে তার চোখের সুমুখে দেখতে পাচ্ছে—তরুণ এই অবিবাহিত যুবক নবীনের আগমন। কতরকমের কত মেয়েই তো পশুপতি দেখলে তার জীবনে। প্রত্যেককেই সে বিচার করেছে তার নিজের বুদ্ধির মাপ-

কাঠি দিয়ে। আর তার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে। এ-ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। মেয়েদের মনের সন্ধান সে কোনোদিনই করেনি। কাজেই দেহ ছাড়া আর কিছু তাদের আছে বলে তো তার মনে হয় না। টাকাকড়ি ধন-সম্পত্তির মত খুব কড়া হাতে তাদের আগ্‌লে রাখতে হয়। আগ্‌লাতে না পারলেই হাত-ছাড়া হয়ে যায়—এই তার ধারণা। সুন্দরী এই মেয়েটির সঙ্গে তার সাংসারিক সম্বন্ধটাও বড় মধুর। শালার স্ত্রী। এই সুবাদে হাসি রহস্য করতে গিয়ে কতদিন কতরকমে সুধার কাছে সে তার মনোভাব প্রকাশ করেছে, কতদিন এই পরম লোভনীয় সম্পত্তিটির দিকে সে তার হাত বাড়িয়েছে তার অন্ত নেই। কিন্তু সুবিধা বিশেষ কিছু করতে পারেনি। যতবার হাত বাড়িয়েছে ততবারই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। সুধা তাকে হাসতে হাসতে বলেছে, আপনার মা-বাবা বোধহয় আপনাকে বাল্যকালেই চিনেছিলেন, তাই বড় ভাল নামটি রেখেছিলেন—পশুপতি। আপনি সত্যিই একটি পশু—মানুষ ন'ন।

পশুপতির রাগ হয়ে গেছে। বলেছে, তোমার স্বামীটি কী ?

সুধা বলেছে, তিনিও ওই আপনারই জাত।

—তাহ'লে আর দোষটা কোথায় ?

সুধা বলেছে, সে-সব বোঝবার ক্ষমতা আপনার নেই। মানুষ হ'লে বুঝতেন।

এই বলে সে পালিয়ে গেছে সেখান থেকে।

পশুপতি আফশোষ করেছে শুধু। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে আর ভেবেছে—তার যৌবনদিনের জৌলুস আজ নেই, তাই বোধ করি এই অবহেলা।

আজ সে তার সুযোগ নিতে ছাড়লে না। ভাবলে, প্রিয়দর্শন এই জমিদার-নন্দনের সঙ্গে নিশ্চয়ই তার এমন একটা-কিছু ব্যবস্থা

হয়ে গেছে—যার জন্য এত শীঘ্র তার এই রূপান্তর ঘটে গেল। বললে, আজ তোমাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে বড়বৌ।

সুধা বললে, সুন্দরকে সুন্দর দেখাবে তাতে আর আশ্চর্য্যি কি? কেন, আপনার কি খুব খারাপ লাগছে?

পশুপতি বললে, খারাপ লাগবে কেন? মাত্রাটা হঠাৎ একটু বেশি হয়ে গেল কিনা, তাই কেমন যেন চোখে ঠেকছে।

—চোখ বন্ধ করুন। আর নয় তো সরে পড়ুন এখান থেকে।

এই তো স্পষ্ট স্বীকারোক্তি! পশুপতিও ঠিক এই কথাই ভেবেছে। তবু সে আর একটু পরিষ্কার করে নিতে চাইলে ব্যাপারটাকে। বললে, এর কারণটা কি, তাই জানতে চাচ্ছি। সেই বললে বললে, একটু পরিষ্কার করে খুলেই বল না।

—শুনে আপনার লাভ কিছু হবে না, মিছেমিছি জ্বলেপুড়ে মরবেন। তার চেয়ে শুনুন, আমার ছোট ঠাকুরঝি—মানে আপনার গিন্নি, চা নিয়ে বসে আছে, যান খেয়ে আসুন, নইলে জুড়িয়ে যাবে।

পশুপতি বুঝলে, বৃথা চেষ্টা। কিছুতেই সে বলবে না। তখন বললে, কথাটা মন্দ বলনি। যাই তবে চা'টাই খেয়ে আসি।

পশুপতি চলে গেল।

নবীনের চা খাওয়া তখন শেষ হয়ে গেছে। কাপটা হাত থেকে নামাতে যাচ্ছিল, সুধা হাত বাড়িয়ে নিতে গেল, নবীন এঁটো কাপটা তার হাতে তুলে দিতে ইতস্তত করছিল, সুধা তার মুখের দিকে এমন ভাবে তাকালে যে, সে আর কোনও কথা বলতে পারলে না, সুধার হাতে কাপ-ডিস তুলে দিয়ে একটু হেসে বললে, বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

কাপ-ডিস নামিয়ে রেখে সুধা ফিরে এসে বসলো খাটের ওপর। নবীন বসে আছে ইজি চেয়ারে—একেবারে মুখোমুখি। সুধা বললে, ভয় পাচ্ছেন?

—পাওয়া স্বাভাবিক। তুমি পরস্ত্রী।

সুধা বললে, আমি কারও স্ত্রী নই। আমি কুমারী।

কথাটা বলেই সে নবীনের মুখের দিকে তাকালে। বললে, মনে মনে হাসছেন তো?

নবীন বললে, না। এটা হাসবার কথা নয়। আমি অন্য কথা ভাবছি।

—কি ভাবছেন?

—ভাবছি, যে-জোরে আজ এই কথা তুমি বলছো, সে-জোর এতদিন তোমার ছিল কোথায়? কতদিন বিয়ে হয়েছে তোমার?

সুধা বললে, তিন বছর।

নবীন বললে, এই তিনটি বছর ধরে শরীরের ওপর, মনের ওপর এই অত্যাচার তুমি নীরবে সহ্য করেছ?

—না, নীরবে সহ্য করিনি। বিদ্রোহ করেছি। বিদ্রোহ করেছি বলেই আমার শ্বশুরের ছেলেটি অন্য আশ্রয় খুঁজেছে, আমার সতীন এসেছে। বিদ্রোহ করেছি বলেই আজ এখানে আমার ঠাঁই নেই।

—বুঝেছি। নবীন বললে, বিয়ের পরেই তোমার পালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল এখান থেকে।

—কোথায়?

—তোমার বাবার কাছে।

—আপনি সব কথা জানেন না, তাই বলছেন। তবে শুনুন।

এই বলে সুধা তার জীবনের কাহিনী খুব ছোট করে জানালে নবীনকে।

সুধার বাবা ছিলেন কলকাতার একটি কলেজের প্রফেসার। সুধার মা ছিল না। মা যে কেমন তা সে জানেই না। বাবা যেখানে গেছেন সেইখানেই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। বাবা থাকতেন কলেজ-হোষ্টেলে আর সুধাও থাকতো মেয়েদের বোর্ডিং-এ। বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতে আসতো সে।

বাবা বলতেন, তোমাকে দেবার মত পয়সাকড়ি আমার কিছুই নেই মা, যতদূর পার লেখাপড়া শিখে নাও।

সুধা তাই অন্য কোনদিকে মন না দিয়ে লেখাপড়া শিখছিল আর গান শিখছিল। ছুটোতেই সে নাম করেছিল। খুব ভাল ছাত্রী ছিল সে।

সুধা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করলে, তারপর আই-এ পাশ করলে। থার্ড ইয়ারে পড়ছে, এমন সময়—

নবীন বললে, তবে যে এরা বললে—

সুধা বললে, এরা যা বলে বলুক্। আমার কথা, আমি যা বলছি তাই সত্যি। সেই সময় বাবার হলো কঠিন অসুখ। আমার বোর্ডিংএ থাকা চললো না। বাবার কাছে এলাম তাঁর সেবা করবার জন্যে। ছেলেদের হোস্টেল। আমি এলাম তাদের মাঝখানে। সেইখানে এসেই প্রথম বুঝলাম—আমি যুবতী, আমি সুন্দরী। ইচ্ছা করলে আমি অনেক কিছু করতে পারি। কিন্তু কোনও কিছু ইচ্ছে করবার মত মনের অবস্থা তখন আমার নয়। বাবার তখন জীবন-মরণ সমস্যা। কেউ বলে, হাসপাতালে দিন, কেউ বলে, আলাদা বাসা করুন। বাবার একটি লাইফ্ ইন্সিওরেন্সের পলিসি ছিল পাঁচ হাজার টাকার। সেই পলিসি 'সারেণ্ডার' করে যা পেলাম, তাই দিয়ে খরচ চালাচ্ছি। এমন সময় বাবার হলো পক্ষাঘাত। মুখ থেকে আরম্ভ করে পা পর্যন্ত বাঁ দিকটা অবশ হয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করলাম, অনেক ওষুধ, অনেক শুশ্রূষা, কিছুতেই কিছু হলো না। পঙ্গু বাবাকে নিয়ে দেশে ফিরে এলাম। দেশে থাকবার মধ্যে ছিল একখানা ছোট বাড়ী, আর বিঘে-পঁচিশেক জমি। আত্মীয় একজন দখল করে বসেছিল। আমাদের দুরবস্থা দেখে বোধ করি তার দয়া হলো। লোকটি ভাল। সব কিছু ছেড়ে দিলে।

ব্যাধি যে মানুষকে কত অসহায় করে ফেলতে পারে, আমার

বাবাকে দেখে আমি তা বুঝেছিলাম। অত বড় একটা বিদ্বান বুদ্ধিমান মানুষ—হয়ে গেলেন যেন একটা জড়পিণ্ড। ভাল করে কথা বলতে পারেন না, যা বলেন ভাও বোঝা যায় না, কশ্ বেয়ে লাল গড়িয়ে আসে, চোখ দিয়ে গড়ায় জল।

তাই না দেখে নিজেও কেঁদে ভাসাই। আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে দিয়ে বলি, কেঁদো না বাবা, চুপ কর।

হাবে ভাবে ইসারায় বাবা বুঝিয়ে দেন, কাঁদছি তোর জন্যে।

বুঝলাম—আমার চিন্তা তাঁকে পীড়িত করে তুলছে। আমার একটা কিছু ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তিনি মরতে পর্যন্ত পারছেন না।

মেয়েছেলের ব্যবস্থা মানে বুঝতেই তো পারছেন—বিয়ে।

বুঝুন আমার অবস্থা।

নবীন খুব মন দিয়ে শুনছিল। বললে, তোমার বিয়ে মানে তো ওই অসহায় পঙ্গু বাবাকে একলা ফেলে চলে যাওয়া!

সুধা বললে, না, একলা নয়। পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে অধিকাংশ শহুরে মানুষের যা ধারণা, আমারও প্রথম প্রথম সেই ধারণাই ছিল। কিন্তু গ্রামে গিয়ে সবই বদ্‌লে গেল। আমাদের বিষয়-সম্পত্তি, বাড়ী-ঘর যাঁর দখলে ছিল তিনি আমার এক দূর সম্পর্কের কাকা। তাঁর এক বিধবা মেয়ে আছে, আমার চেয়ে বছর-চারেকের বড়। সেই তরুদিই বাবার সেবাযত্নের ভার নিয়েছিল। তরুদির বাবা দেখতো বিষয়-সম্পত্তি, আর তরুদি দেখতো বাবাকে।

এমন দিনে এইখানে—আপনার এই গোমস্তার ছেলের সঙ্গে হলো আমার বিয়ের সম্পর্ক। কাকা এলো ছেলেটিকে দেখতে। নিতান্ত নিরীহ ভালমানুষ কাকা আমার বাবাকে গিয়ে বললে, বেশ ছেলে। ছেলেটি ইঞ্জিনিয়ার। কলকাতায় কাজ করে। ছেলের বাপ—জমিদারের ম্যানেজার। দিব্যি বাড়ী-ঘর, পুকুর, বাগান, বিষয়-সম্পত্তি—অভাব কিছু নেই। সুধা খুব সুখে থাকবে।

সুধা ম্লান একটুখানি হেসে বললে, আপনার এই কাছারি বাড়ী, আপনার যা-কিছু সবই আমার শ্বশুর তাঁর নিজের বলে চালিয়ে দিয়ে দেখতে গেলেন আমাকে। তার পর বুঝতেই পারছেন—আমাকে.শুধু দেখেই এলেন না, ধানদূর্বা আর একটি টাকা দিয়ে আশীর্বাদ করে বিয়ের দিন পর্যন্ত ঠিক করে চলে এলেন। নিশ্চিন্ত হলেন পক্ষঘাতগ্রস্ত মৃত্যুপথযাত্রী আমার বাবা।

নবীন বললে, বুঝলাম।

সুধা বললে, না, বোঝেননি এখনও।

নবীন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, বুঝেছি। এই জন্যেই তুমি তোমার বাবার কাছে ফিরে না গিয়ে মুখ বুজে সব সহ্য করেছ।

এই কথা বলেই হঠাৎ তার কি যেন মনে হলো। বললে, কিন্তু সুধা, এখনই বা তুমি যাবে কেমন করে? তোমার একটি ছেলে হয়েছে, তুমি বেশ আনন্দে আছ—এইটিই তো তিনি জানেন। তার ওপর সেই ছেলেকে এখানে রেখে একা-একা কোন্ মুখে গিয়ে দাঁড়াবে তোমার বাবার কাছে? কি বলবে?

—বলবার দরকার হবে না।

কি রকম যেন অস্বাভাবিক কণ্ঠে কথাটা বলেই সুধা চোখ দুটো তার নামিয়ে নিয়ে মুখ নীচু করে বসে রইলো।

কথা বলতে বলতে বাইরের আকাশে কখন্ সূর্যাস্ত হয়ে গেছে তারা বুঝতে পারেনি। ঘরের ভেতর আলো কমে এসেছে। নবীনের মনে হলো সুধা যেন থর্ থর করে কাঁপছে।

নবীন আর বসে থাকতে পারলে না। ইজি চেয়ার ছেড়ে সুধার কাছে এসে দাঁড়ালো। জিজ্ঞাসা করলে, কি হ'লো সুধা? অমন করছো কেন?

মানুষ অনেক সময় মনের ভুলে অজান্তে এমন কাজ করে বসে—যা হয়ত করা তার উচিত নয়। নবীনও আজ তাই করে বসলো। দু'হাত বাড়িয়ে সুধার দুই কাঁধে হাত রেখে ডাকলে, সুধা।

মনে হ'লো সুধা যেন কাঁদছে।

নবীনের বাঁ হাতটা রইলো তার কাঁধের ওপর, ডান হাত দিয়ে সুধার মুখখানি তুলে ধরতেই দেখলে তার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে।

—তুমি কাঁদছো?

সুধা যেন ভেঙ্গে পড়লো। দু'হাত দিয়ে নবীনকে জড়িয়ে ধরে তার বুকের ওপর নিজের মাথাটা এলিয়ে দিয়ে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠলো।

নবীন সান্ত্বনা দিলে।—'কেঁদো না। আমি সব বুঝতে পেরেছি। তোমাকে যেতে হবে না তোমার বাবার কাছে।'

সুধা মুখ তুললে। তেমনি ধরা ধরা গলায় বললে, না, যাব না। বাবা মারা গেছে।

নবীন যেন চমকে উঠলো।—সে কি! কখন? কই, সে-কথা তো—

সুধা বললে, কেউ জানে না। কাউকে বলিনি। তরুদি আমাকে একখানা চিঠি লিখেছে। খামের চিঠি। কেউ খোলেনি। লিখেছে, খবরটা তোকে না জানিয়ে পারলাম না। তুই দুঃখু করিস না। উনি মরে বেঁচে গেছেন। নিষ্কৃতি পেয়েছেন। আজ কুড়ি দিন হলো।

সুধার কাপড়ের আঁচলটা তুলে নিয়ে নবীন তার চোখের জল মুছে দিচ্ছিল। কারও মুখে কোন কথা নেই। সুধা তখনও জড়িয়ে ধরে আছে নবীনকে।

নবীন চুপিচুপি বললে, একটা কথা বলবো?

সুধাও তেমনি চাপা গলায় জবাব দিলে, কি কথা?

নবীন বললে, তুমি যাবে আমার বাড়ীতে?

এতক্ষণে সুধার যেন জ্ঞান ফিরে এলো। নিজের হাত দুটো সরিয়ে নিয়ে নবীনের দিকে একদৃষ্টে তাকালে। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। ঘরের আবছা আলোতে স্পষ্ট দেখা গেল, মুখখানি তার

আরও সুন্দর, আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চোখের জলটা মুছে দিয়েছে নবীন, কিন্তু কান্নার ছাপটা মুছতে পারেনি। তবু মনে হলো সুধার ঠোঁটের ফাঁকে কেমন যেন একটুখানি হাসি ফুটে উঠেছে।

জবাবের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল নবীন।

সুধা উঠে দাঁড়ালো। দু'জন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। নবীন তার একখানা হাত চেপে ধরে বললে, বল, যাবে?

সুধার গলাটা ধরে এসেছিল না আনন্দে ওই রকম হয়ে গেল কে জানে। ভারি মিষ্টি শোনালো চাপা কণ্ঠের সেই আওয়াজ। বললে, না।

নবীন আশা করেনি—সে 'না' বলবে। তাই সে আবার জিজ্ঞাসা করলে, কেন?

সুধা বললে, না। তোমাকে আমি বিপদে ফেলতে পারব না।

এই প্রথম সে নবীনকে 'আপনি' না বলে 'তুমি' বললে।

নবীন আরও জোরে চেপে ধরলে তার হাতখানা। জিজ্ঞাসা করলে, তাহ'লে কি করবে তুমি? কোথায় যাবে?

সুধা জবাব দেবার আগেই ঘরে ঢুকলো পশুপতি।

—আজ আর আপনার পোষ্টাপিস যাওয়া হলো না দেখছি।

চট্ করে সুধার হাতটা ছেড়ে দিলে নবীন।

সুধা কিন্তু ঠায় তেমনি দাঁড়িয়ে থেকেই জবাব দিলে, আমিই যেতে দিলাম না।

বলেই সে তার কাপড়ের আঁচলটা তুলে নিচ্ছিল ভাল করে। পশুপতি বললে, কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে গেল যে ঠাকরুণ, আলোটা জ্বালবার কথা ভুলে গিয়েছিলে বুঝি?

সুধা বললে, না ভুলিনি। আপনি চোরের মত এরকম ছুট্ করে এসে পড়বেন ভাবতে পারিনি।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর নবীনের চোখে ঘুম আর আসে না

কিছুতেই। ঘুমেরই বা দোষ কি? সুধা আজ তার জীবন থেকে সব ঘুম যেন হরণ করে নিয়েছে। ঘুম বা স্বপ্ন—সবই যেন অস্পষ্ট, সবই যেন ছায়া। কিন্তু আজ আর অস্পষ্ট ছায়ার কোনও স্থান নেই তার জীবনে। আজ তার কাছে সবই স্পষ্ট, সবই পরিষ্কার।

দিবালোকের মত স্পষ্ট পরিষ্কার সেই আলোর সামনে সুধাকে সে একবার টেনে আনলে। পূর্ণযৌবনা স্বাস্থ্যবতী এই সুন্দরী নারী তার জীবনের যে-ছবি তুলে ধরেছে, তা' যেমন মর্মান্তিক তেমনি শোচনীয়। কিন্তু তার এই বঞ্চনার ইতিহাসকে সে একটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর-কিছুই ভাবে না। সুধা বলে, এ-সব কথা তার মনে থাকে না। অনায়াসে ভুলে যেতে পারবে।

রহস্যময়ী নারী!

পরের দিন সকালেও সে বারকতক এসেছিল নবীনের কাছে। সহজ সুন্দর হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করেছিল, রাত্রে ঘুমিয়েছিলেন, না, সারারাত ধরে আমার কথা ভেবেছেন?

নবীন জিজ্ঞাসা করেছিল, সেকথা তুমি জানলে কেমন করে?

—বা-রে, একটু বুঝতে পারব না? আমিও যে অনেকক্ষণ আপনার কথা ভেলেছিলাম।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, কি ভেবেছিলে?

সুধা বললে, ভাবনার কি ছাই মাথামুণ্ডু আছে! ভেবেছিলাম আপনার এই নতুন জীবন, এখনও বিয়ে-থা করেননি, মেয়েদের সম্বন্ধে ভাসা-ভাসা একটা স্বপ্ন আপনার আছে, সে স্বপ্ন হয়ত-বা ভেঙ্গে দিলাম আমি।

নবীন তার কথাগুলো শুনলো কিনা কে জানে। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো তার মুখের দিকে। যুবতী অনেক মেয়ে সে দেখেছে, সুন্দরীও কম দেখেনি, কিন্তু এ-মুখে যা দেখলে, তেমনটি কোথাও দেখেনি। যৌবনদিনের বিচারবুদ্ধিহীন উন্মাদনা—সুন্দর কিছু দেখলেই লোভাতুর একটি সলজ্জ চপলতার এখানে একান্ত

অভাব। সন্তানের জননী সে। তবু তার মুখে কৌমার্যের কেমন যেন একটি আশ্চর্য সরলতা।

সুধা চলে গেল। নবীনের তাকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে না। মনে হয়, বসে থাক্ সে তার চোখের সাম্‌নে। বসে বসে গল্প করুক্, তার যা-খুশী সে বলে যাক্। নবীন শুধু তাকে দেখবে।

দেখে দেখে কিছুতেই যেন তার সাধ আর মিটছে না।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? শুধু কি সে তাকে দেখতেই চায়? আর কিছুই সে চায় না তার কাছ থেকে? মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে লাভ নেই। সত্যকে অস্বীকার করতে সে চায় না।

কিন্তু তাদের এই দুটি মনের সমর্থন ছাড়া এতে আর কোথাও কারও সমর্থন তারা পাবে না। না সমাজের, না আইনের।

সুতরাং এ অপবাদের কলঙ্ক সুধাকে যাতে স্পর্শ না করে সেদিকে তাকে সতর্ক সজাগ থাকতে হবে।

অথচ সতীশের বড় ছেলে না আসা পর্যন্ত তাকে থাকতে হবে এখানে।

মাকে সেকথা জানিয়ে দেওয়া উচিত। সেদিন তাই খাওয়া-দাওয়ার পর নবীন তাড়াতাড়ি তার জামাকাপড় পরে ফেললে।

সুধা এসে পড়লে আর পোষ্টাপিসে যাওয়া হবে না।

বন্দুকটা হাতে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লো।

৩ ॥

গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে পোষ্টাপিস।

রাস্তার ধারে ছোট্ট একটি মাটির ঘর। মাথার ওপর খড়ের চাল।

পোষ্টাপিসের দরজায় তালা দেওয়া দেখে নবীন রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে পড়লো। এখন আসা বোধ হয় উচিত হয়নি। আর একটু পরে এলেই হতো।

একজন লোক পেরিয়ে যাচ্ছিল, নবীন জিজ্ঞাসা করলে, পোষ্টাপিস কখন খুলবে বলতে পারেন?

লোকটি বললে, পোষ্টমাষ্টার বোধ হয় খেতে গেছেন। এক্ষুনি আসবেন।

—কোথায় খেতে গেছেন? নবীন জিজ্ঞাসা করলে।

লোকটি বললে, গ্রামের ভেতর তাঁর কে যেন আছেন। তাঁরই বাড়ীতে থাকেন, সেইখানেই খান। ভদ্রলোক বিয়ে-থা করেননি এইখানে একটু অপেক্ষা করুন। উনি এলেন বলে।

লোকটি গ্রামের দিকেই চলে গেল।

নবীন এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখছিল।

গ্রামের এ দিকটায় সে আসেনি কোনদিন। পাশেই লাল রঙের টালির একখানি সুন্দর বাড়ী—অনেকখানি জায়গা ছোট ইঁটের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। উঠোনে কয়েকটা বড় বড় আমের গাছ।

হঠাৎ একটা কাঁচা আম ঠাঁই করে তার কপালে লেগে মাটিতে পড়ে গেল। আমটায় কে যেন একটা কামড় দিয়ে খানিকটা কেটে নিয়েছে। স্পষ্ট দাঁতের দাগ।

সত্যিই বেশ জোরেই লেগেছে তার কপালে।

এমন করে আমটা কে ছুঁড়লে দেখবার জন্মে নবীন যেই তাকিয়েছে, দেখলে, পাশের বাড়ীর উঠোনের একটা আম গাছের একটা ডাল ছ'হাত দিয়ে ধরে একটি মেয়ে ঝুলে পড়েছে। ভেবেছিল হয়ত ঝুপ্ করে লাফিয়ে পড়তে পারবে, কিন্তু পায়ের নীচের মাটিটা যে এত দূরে তা সে ভাবতে পারেনি। ডাল থেকে হাত ছুটো ছাড়তে তার সাহস হচ্ছে না।

পেছন ফিরে ঝুলছে মেয়েটি। মুখখানা দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু পেছন থেকে তার সমস্ত অবয়ব চোখে পড়ছে। পরণের কাপড়টা আঁটসাট্ করে পরা, ফর্সা গায়ের রং, হাত পায়ের গড়ন চমৎকার।

নবীন তার হাতের বন্দুকটা প্রাচীরের দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি গাছের নীচে গিয়ে ছ'হাত দিয়ে মেয়েটির কোমরের কাছটা জড়িয়ে ধরে বললে, হাত ছুটো ছেড়ে দাও এবার।

এমন অতর্কিতে যে এমন একটা অঘটন ঘটে যাবে—মেয়েটি তা' ভাবেনি। হাত ছুটো ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি মাটিতে পা রাখতে গিয়ে মেয়েটির অবস্থা হলো আরও খারাপ। আর একটু হলেই সে মুখ থুব্ড়ে পড়ে মরতো, কিন্তু নবীন তাকে পড়তে দিলে না। প্রাণপণে তাকে বাঁচাতে গিয়ে আরও ভাল করে তাকে জড়িয়ে ধরলে। তার মুখের ওপর নবীনের চোখ পড়তেই তাকে সে চিনতে পারলে। কাল তার হাত থেকে পাখীটা একরকম কেড়ে নিয়ে এই মেয়েটিই মনে হচ্ছে যেন গোপালের মন্দিরে ঢুকেছিল।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, তোমাকেই না কাল আমি—

কথাটা তার শেষ হলো না। সে এক অপরূপ ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে সলজ্জ একটুখানি হেসে মেয়েটি ছুটে তাদের বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়লো। বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে সেইদিকে তাকিয়ে রইলো নবীন। বাড়ীতে লোকজন কেউ আছে বলে মনে হলো না। কোথাও

কোনও সাড়াশব্দ নেই। দূরের গাছ থেকে নাম-না-জানা একটা পাখী বড় সুন্দর শিশ্ দিচ্ছে।

নবীন বেরিয়ে এলো থেকে যেখান। বন্দুকটা নামিয়ে রেখেছিল দেওয়ালের গায়ে। সেটা সে তুলে নিতেই দেখলে, গোপাল-মন্দিরের ভৈরব পূজারী আসছে সেইদিকে এগিয়ে।

পূজারীকে দেখে সে একটু অবাক হয়ে গেল।

অবাক হবার কথাই।

কাল সে তাকে কাছারি বাড়ীতে দেখেছিল পূজারীর বেশে, আর আজ দেখলে তার পরণে সাদাসিদে একখানা খাটো কাপড়, খালি গা, খালি পা, ডাকপিওনের একটা ব্যাগ চামড়ার ফিতে দিয়ে কাঁধে ঝোলানো।

ভৈরব ঠিক চিনতে পেরেছে নবীনকে। বললে, তুমি এসেছ আমার বাড়ী দেখতে? এসো এসো—আমার কি সৌভাগ্য! বসো বাবা, বসো! মালা! মালা!

নবীন তার কাঁধের ব্যাগটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, এটা আপনার কাঁধে কেন?

ভৈরব সে-কথার কোন জবাব না দিয়ে কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামাতে নামাতে বললে, মোড়া ছুটো বের করে দে। আমরা বাইরেই বসি।

নবীনের মনে পড়লো—সতীশ বলেছিল ভৈরব কালা, কানে শুনতে পায় না।

বাংলো-বাড়ীর মত বেশ সুন্দর বাড়ী। সুমুখে বেশ চাওড়া রক। নবীন তার হাতের বন্দুকটা নামিয়ে রকের ওপর বসে পড়লো। বললে, মোড়ার দরকার হবে না। বেশ বসেছি।

—ওইখানেই বসলে? তা বেশ করলে।

বলে নিজেও সেখানে বসে পড়লো। বললে, মালা, দে, আমাদের চা দে।

তারপর বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে বললে, এই বাড়ী—তোমার বাবা তৈরি করিয়ে দিয়েছিল। সব দেবোত্তর। তোমার বাবার সঙ্গে তুমি একবার এসেছিলে—তখন তুমি খুব ছোট। আমার ছেলে মণি বাড়ীতে ছিল না, তুমি ছুটে ছুটে খেলা করেছিলে আমার মেয়ে মালার সঙ্গে। মালার মা ঠিক সেই বৎসর মারা যায়। তোমার বাবা আর আমি—এইখানে বসে বসে গল্প করছিলাম। সে আজ কতদিনের কথা, তবু মনে হচ্ছে যেন এই সেদিন। আজ তুমি এসেছ আমার বাড়ীতে—মালার মা যদি আজ বেঁচে থাকতো —কী খুশীই-না হতো! এই আমগাছটি—তোমার বাবা এনেছিলেন কলকাতা থেকে। এই জাতের আম কাছারির উঠোনে আছে একটি। কাঁচাতে যেমন টক্, পাকলে তেমনি মিষ্টি। মালার মা নিজের হাতে পুঁতেছিল গাছটি। সে আর এ-গাছের আম খেতে পেলে না, খেলে তার ছেলে-মেয়ে।

বলতে বলতে চোখ দু'টি তার জলে ভরে এলো। হাত দিয়ে চোখ মুছে আবার বললে, যাক্‌গে। সে-সব কথা অনেক ভেবেছি—আর ভাবি না। ওই মেয়েটাকে নিয়ে ভুলে আছি তার দুঃখু। মালা, লজ্জা করিস না মা, বেরিয়ে আয়। প্রণাম কর তোর—এই ছাখো, তোমার নামটি ভুলে গেছি।

নবীন বললে, নবীন।

ভৈরব বললে, প্রণাম কর তোর উপীনদাকে। কথাবার্তা বল্। তা হ্যাঁ-বাবা উপীন, আমাকে তো কই জিজ্ঞাসা করলে না—আমার কাঁধে চামড়ার এই ব্যাগটি কেন?

নবীন বললে, জিজ্ঞাসা করেছিলাম, জবাব দেননি।

কি শুনতে কি শুনলে ভৈরব। বললে, আমি জবাব দেবো? কার কাছ থেকে শুনলে? ছাখো দেখি কথা! সামান্য পিওনের চাকরি। মাসে পনেরটি করে টাকা পাই। তাতে আমার কত

উপকার হয়। আমি ছুটোই করব। গোপালের পুজোও করবো, পিওনের কাজও করব।

এতক্ষণে মালা বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। পরণের শাড়ীটাও বদলেছে, জামাটাও বদলেছে। হাসতে হাসতে এসে প্রণাম করলে নবীনকে। পায়ে হাত দিয়ে সেই হাত মাথায় ঠেকিয়ে, তার বাবাকেও তেমনি করে প্রণাম করে আবার চট্ করে ঘরে ঢুকে গেল। বললে, চা আনছি।

ভৈরব আবার বলতে আরম্ভ করলে, পিওনের চাকরি কেন নিয়েছি শোনো তবে। আমার ছেলে মণি—ঘরের খেয়ে পাশের গাঁয়ের স্কুল থেকে পাশ করলে। বললাম, এবার একটি চাকরি-বাকরি কর্। বোনের বিয়ে দিতে হবে। ছেলে ধরে বসলো—সে পড়বে। কিন্তু কলকাতায় ছেলে পড়ানো কি চাট্টিখানি কথা! মালা তার মায়ের একটা গয়না দিলে বিক্রি করে। ব্যস্, সেই পঞ্চাশটি টাকা নিয়ে মণি কলকাতায় চলে গেল। তোমার ম্যানেজারবাবু এসেছিলেন এখানে, তাঁকে গিয়ে ধরলুম। শুনলুম তাঁর একটি মেয়ে নাকি পড়ে কলকাতায়; বললাম, ওই সঙ্গে এই গরীবের ছেলেটাকেও পড়িয়ে দিন। তোমার বাবার আমলের লোক তো! চেনেন আমাকে। মাসে মাসে দশটি টাকার ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি। আর আমাদের এই পোষ্টমাষ্টার—

বলেই হাত ছু'টি জোড় করে তার উদ্দেশে একটি প্রণাম জানিয়ে বললে, মানুষ নয়—দেবতা। বললে, পিওনের কাজটা কর। আমি আরও পনেরটি টাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এই পনেরো আর ম্যানেজারের দশ—এই পঁচিশটি করে টাকা, তার ওপর মণি একটি ছেলে-পড়ানোর কাজ জোগাড় করে নিয়েছে সেখানে। তাইতেই মণির পড়া চলছে। ছেলে আমার বি-এ পড়ছে।—ছাখো আমার এত কষ্টের টাকা, আর তুমি বললে কিনা আমি বলেছি গোপালের পুজোয় জবাব দেবো! জবাব দেবো

তো খাব কি ? কে বললে তোমাকে ? ও, বুঝেছি। সতীশের ওখানে ছিলে, সতীশ বলেছে।

নবীন বেশ জোরে জোরে ভৈরবকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, না না, সতীশ কিছু বলেনি আমাকে। তাকে কিছু বলবেন না।

ভৈরব বললে, কেন বলবো না ? তোমাকে বলব না তো বলব কাকে ? গোপালের দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে আমার যা পাবার বরাদ্দ, তার সিকির সিকি ভাগ আমাকে দেয় না সতীশ। গোপালের রাত্রের ভোগ ছিল আড়াই সের দুধ। সেই দুধ কমে কমে এখন হয়েছে আধসের। জল ঢেলে ঘটি ভর্তি করে মন্দিরে পাঠিয়ে দেয়। বলতে গেলে সতীশের বৌটা তেড়ে মারতে আসে। আমি কানে একটু কম শুনি বলে আমাকে বলে কালাপাহাড়, বলে কালাভৈরব।

নবীন বললে, আমি সব বুঝতে পেরেছি।

ভৈরব কিন্তু আপন মনেই বলে যেতে লাগলো—একবার ভেবেছিলাম, যাই একবার তোমার মা'র কাছে। গিয়ে সব বলে আসি। কিন্তু যাব কেমন করে ? একদিকে গোপালের পূজো, একদিকে পোষ্টাপিস। কোনোটাই কামাই করবার জো নেই।

মালা দু'পেয়ালা চা নিয়ে এলো।

ভৈরব চা খেতে খেতে মালাকে দেখিয়ে বললে, আমার এই মেয়েটি না থাকলে আমি কি কষ্টে যে পড়তাম! নিজে রেঁধে খেতে হতো!

নবীন চায়ের পেয়ালাটা মুখে দিয়েছিল। কথাটা শুনে মালার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললে, সেইজন্যে বুঝি এখনও ওর বিয়ে দেননি ?

মালা পালিয়ে গেল। 'বিয়ে' কথাটা ভৈরব শুনতে পেয়েছিল। বললে, বিয়ে দেবার জন্যে একটি পাত্র তো খুঁজছি। ছাখো দেখি বাবা উপীন, তোমার জানাশোনা ভাল ছেলে যদি একটি পাও।

এমন সময় দূর থেকে কে যেন 'ভৈরব' 'ভৈরব' বলে ডাকছে মনে হলো।

নবীন বললে, আপনাকে কে যেন ডাকছে।

ভৈরব বললে, এই ছাখো, ভুলেই গেছি। ডাকঘরের কাজটা চুকিয়ে আসি।

বলেই সে হাত থেকে খালি কাপটা নামিয়ে দিয়ে ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিলে।

নবীনেরও মনে পড়লো তার মাকে চিঠি লিখবার কথা। পকেট থেকে একটি সিকি বের করে ভৈরবের হাতে দিয়ে বললে, একটি খাম আনবেন দয়া করে?

ভৈরব বললে, খাম? একটি? আনবো। বলে সে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

খালি পেয়ালা হুটো নিতে এলো মালা। কিন্তু পেয়ালা নিতে গিয়ে দেখলে নবীন আধ পেয়ালা চা খেয়ে বাকি আধখানা ফেলে রেখেছে।—চা কি আপনার খাওয়া শেষ হয়েছে?

—হ্যাঁ। আমি বেশি চা খাই না। বলে নবীন একবার মালার আপাদমস্তক বেশ ভাল করে দেখে নিলে। এ আবার কেমন ধরনের মেয়ে কে জানে। সুন্দরী তরুণী। এত বড় আইবুড়ো মেয়ে পল্লীগ্রামে সাধারণত থাকে না। বাপ গরীব—তাই বোধ হয় বিয়ে দিতে পারেনি।

চায়ের কাপ হুটো হাতে নিয়ে মালা চলে গেল।

পাশেই রান্নাঘর। রান্নাঘরের সুমুখে বড় একটা টবে জল তোলা রয়েছে। সেই জলে কাপ-ডিস হুটো ধুতে ধুতে মালা জিজ্ঞাসা করলে, পান খাবেন?

নবীন বললে, না। আমি পান খাই না।

মালা বললে, বাঁচা গেল। পান নেইও বাড়ীতে। বাবাও খায় না, আমিও খাই না

নবীন বললে, যদি বলতাম খাব, তাহ'লে কি করতে?

একটুখানি চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলে মেয়েটা। তার পর সোজা নবীনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, বলতাম, নেই।

—বলতে পারতে? লজ্জা করতো না?

মালা বললে, সত্যি কথা বলতে আমি লজ্জা পাই না।

বলেই সে বোধ করি কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করলে। বললে, গোমস্তা-গিন্নি কি খাওয়ালে আপনাকে?

নবীন বললে, অ-নেক।

মালা বললে, ভাগ্য তাহ'লে আপনার ভাল বলতে হবে।

—ভাগ্য আমার চিরকালই ভাল। বলেই নবীন মুখ ফিরিয়ে মালার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কেন বলতো?

মালা বললে, এই খাওয়ানোর ব্যাপারে গোমস্তা-গিন্নির খুব নাম-ডাক আছে কিনা, তাই বললাম। কি কি রান্না করেছিল?

নবীন বললে, তা কি আমার মনে আছে? তোমার কাছে বলতে হবে জানলে মনে মনে একটা লিষ্ট্ করে নিতাম।

কি একটা কথা যেন বলতে গেল মালা। কিন্তু মুখের কথা তার মুখেই আটকে রইলো। ভৈরব এসে গেল। কাজেই বলা আর তার হলো না।

ভৈরব এসেই একটি খাম নবীনের হাতে দিয়ে বললে, ছাখো উপীন—

নবীন বললে, উপীন নয়, নবীন।

ভৈরব বললে, আচ্ছা বেশ। বিপিন বলেই ডাকবো।

মালাকে এগিয়ে আসতে হলো। বাপের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে দিলে, বিপিন নয়—নবীন। ন-বী-ন।

ভৈরব বললে, ও, নবীন। বেশ, তাই হলো। শোনো নবীন, আমি একবার যাব তোমার মা'র সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু কি

মুস্কিল হয়েছে জানো? একদিকে গোপালের পুজো, আর এক-দিকে পিওনের চাকরি। কোনটাই কামাই করবার জো নেই। তাই যাওয়া হয় না। কি করি বল দেখি?

মস্ত এক সমস্যার কথা। সত্যিই তো, কেমন করে যাবে সে? কিন্তু এ-কথার কী জবাব দেবে নবীন? নিতান্ত অসহায়ের মত নবীন একবার চাইলে মালার মুখের দিকে। মালাই-বা কি জবাব দেবে?

কিন্তু জবাব একটা সে দিলে। বললে, চিঠি বিলির কাজটা কিন্তু আমি নিতে পারি। বাড়ীতে-বাড়ীতে চিঠিগুলো ফেলে দিয়ে আসা। এই তো?

নবীন বললে, তা তুমি পারো। তাহ'লে সেই কথা বলি তোমার বাবাকে?

মালা তাড়াতাড়ি তাকে নিষেধ করলে।—না না, বলবেন না। বাবা আমাকে খুন করে ফেলবে তাহ'লে। বাবার একদিন জ্বর হয়েছিল, আমি বলেছিলাম, ও-পাড়ার চিঠিগুলো আমি দিয়ে আসি বাবা। বাবা বলেছিলেন, খবরদার বলছি, যাবি না। পা খোঁড়া করে দেবো।

দু'জনে কি কথা হচ্ছে কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে তাদের মুখের দিকে চেয়ে ছিল ভৈরব। কথা শেষ হতেই নির্বোধের মত একটুখানি হেসে নবীনকে জিজ্ঞাসা করলে, কি বলছে?

নবীন বললে, বলছে দুটো কাজ নিয়ে আপনি খুব বিপদে পড়েছেন।

ভৈরব বললে, বিপদ বলে বিপদ! ঠিকই বলেছে। তাছাড়া আর একটা বিপদ আছে। তোমার মা'র কাছে গিয়ে যে দুটো কথা বলবো, দেখা করবো, খাব-দাবো, চলে আসবো—তা আর হচ্ছে না। যেতে হবে ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে। গিয়ে বলতে

হবে—আপনার দেবোত্তরের যা বরাদ্দ, তাতে আমাদের পেটই ভরে না দু'বেলা,—তা ছেলেকেই-বা পড়াবো কেমন করে, আর এই মেয়েটার বিয়েই-বা দেবো কেমন করে!

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, মেয়ের বিয়ে কি কোথাও ঠিক করেছেন?

ভৈরব বললে, ছেলে কোথায় পাব? দাও না একটি ঠিক করে। আমার মেয়েকে তো দেখছো।

নবীন আর-একবার মেয়েটিকে দেখবার চেষ্টা করলে। কিন্তু দেখতে পেলে না। মালা তখন পালিয়েছে।

ভৈরব বললে, সতীশের ছোট মেয়েটাকে তো দেখলে! মালা আর ওই উমা একই বয়সী। উমার বিয়ে দিয়েছে সতীশ। জামাইটিকে দেখলাম—এইখানেই রয়েছে। তুমিও দেখেছো নিশ্চয়ই?

নবীন বললে, দেখেছি বই-কি! খুব ভাল করেই দেখেছি।

ভৈরব হাসলে। বললে, ওই রকম জামাই পাওয়া যায়। তা ও-রকম জামাই করার চেয়ে মেয়ের বিয়ে না দেওয়াই ভাল।

নবীনও হাসলে। বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ, মেয়ের বিয়ে নাই-বা দিলেন। মেয়ে আপনার বেশ ভালই আছে।

ভৈরব আবার উল্‌টো বুঝে বসলো।—কি বললে? ভাল? ওই জামাই ভলো?

—আজ্ঞে না, তা বলিনি। নবীনকে আবার চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে হলো।—বলছি, মেয়ে আপনার বেশ ভালই আছে।

ভৈরব এবার ঠিকই শুনতে পেলে। বললে, হেঁ হেঁ বাবা, এ তো আর সতীশের মেয়ে নয়! মা-বাবা যেমন, তাদের ছেলে-মেয়েও হবে তেমনি। আমার ছেলে-মেয়ে কখনও খারাপ হতে পারে না।

নবীন বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, তা সত্যি। দিব্যি কেমন গাছে

উঠছে, গাছে উঠে আম পাড়ছে, নুন দিয়ে দিয়ে গাছের ডালে বসে আম খাচ্ছে, আবার হাতের তিক্ পরীক্ষা করবার জন্যে ভদ্রলোকের মাথা লক্ষ্য করে, এমন এক একটা আম ছুঁড়ছে যে মাথাটা ফেটে যাবার—

কথাটা শেষ করতে পারলে না। চমৎকার একটি হাসির আওয়াজ শুনে নবীনকে থামতে হলো। তাকালে সেইদিকে, কিন্তু মালাকে দেখতে পেলে না।

ভৈরব কি শুনতে কি শুনেছে কে জানে, বললে, যা বলেছ! মাথার ঠিক থাকে না।

নবীন অতি কষ্টে হাসি চেপে বললে, তবে আমার মাথার ওপরেই আপনার এই মেয়েটির আক্রোশ যেন একটুখানি বেশি। তখন মন্দিরে একটা পাখী না হয় মেরেই ফেলেছিলাম! অম্‌নি দিলে পাঠিয়ে আপনাকে কাছারি বাড়ীতে—আমাকে আচ্ছা করে ধম্‌কে অপমান করে দেবার জন্যে। তারপর ধরুন—

ভৈরব বোধ হয় 'অপমান' কথাটা শুনতে পেয়েছিল। বললে, না না, অপমান কিসের বাবা? আমি গিয়ে দাঁড়াবো তোমার মায়ের কাছে, এতে আমার অপমান কেন হবে?

এতক্ষণ পরে মালা বোধ হয় আর সহ্য করতে পারলে না। বেরিয়ে এলো ঘরের ভেতর থেকে। বেরিয়ে এসে তার বাবার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বেশ জোরেই বললে, বাবা! কানে তুমি একদম শুনতে পাও না। উনি কি বলছেন আর তুমি কি জবাব দিচ্ছ!

ভৈরব কি বুঝলে কে জানে। সে এক অদ্ভুত রকমের মুখভঙ্গী করে বললে, এই কানের চিকিচ্ছে যে করাব—তারও উপায় নেই। সরকারী ডাক্তার বলে, বেশ তো আছেন। লোকের গালমন্দ শুনতে হয় না।

বাবাকে বোধ করি অন্য কথা বলে তার বিয়ের কথাটা চাপা

দিতে চাইলে মালা। বললে, ওঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—গোমস্তা-গিন্নি কেমন খাওয়ালে। উনি বলতে পারলেন না।

ভৈরব বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাও তো বটে! থাকতে তো পারবে না। কাছারি বাড়ীটা তোমার নিজের হতে পারে, কিন্তু বাবা, সতীশ যেখানে বাস করে, সেখানে তো কোনও ভদ্রলোকের থাকা চলে না!

নবীন বললে, আজ্ঞে না, তা চলে না। কিন্তু কি করব বলুন, সতীশের বড় বৌকে নিয়ে একটা বিশ্রী হাঙ্গামা বেধেছে, কাজেই ওর বড় ছেলে কলকাতা থেকে না আসা পর্যন্ত আমাকে ওখানে থাকতেই হবে।

মালা মুখ টিপে একটু হেসে বললে, বাবা, হয়ে গেছে! আসবা-মাত্র জড়িয়ে পড়েছেন এক ঝামেলায়।

কথাটা মালা বোধ করি নবীনকে শুনিয়েই বললে। কিন্তু তার জবাব দিলে ভৈরব। বললে, ঝামেলা! এতটুকু ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা নেই আমার বাড়ীতে।

এই বলে সে উঠে দাঁড়ালো। নবীনের হাতে ধরে তাকে এক-রকম টানতে টানতে নিয়ে গেল ঘরের ভেতরে। তারপর ঘরগুলি দেখিয়ে দেখিয়ে বলতে লাগল, এই ঘরখানি আমার ছেলে মণির। এই ঘরে আমি থাকি, এই ঘরে থাকে মালা, আর এই ঘরখানা তো পড়েই আছে। তুমি এইখানে থাকতে পারো, এই মালার ঘরে। মালা থাকবে এই ছোট ঘরটায়। সতীশের চেয়ে তোমার ওপর আমার জোর বেশি। তা জানো? মালা ঠিকই বলেছে।

পোষ্টমাষ্টার মশাই-এর ডাক শোনা গেল, ভৈরব! ভৈরব!

মালা ঘরে ঢুকলো। বললে, বাবা, তোমাকে ডাকছেন মাষ্টারমশাই।

—যাচ্ছি। বলে ভৈরব বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ালে। কিন্তু যাবার আগে মালাকে বলে গেল, ঠিক বলেছিস তুই। এ গাঁয়ে

যে-ক'দিন থাকতে হয়, বিপিন এইখানেই থাকবে। আমি কাছারি বাড়ীতে গিয়ে সতীশকে বলে দিয়ে আসব।

এই বলেই ভৈরব ছুটলো পোষ্টাপিসের দিকে।

নবীন আর মালা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

মালা বললে, বাবাকে নিয়ে আমার হয়েছে এক জ্বালা। আমি কখন্ বললাম আপনাকে এখানে থাকতে ?

নবীন বললে, তোমার ভয় নেই, আমি এখানে থাকবো না।

—এই দেখুন, আপনিও আবার আমার পেছনে লাগলেন!

নবীন বললে, ওটা আমার স্বভাবের ধর্ম।

একটুখানি হেসে মালা বললে, স্বভাবটা ভাল নয়।

বলেই সে চলে যাচ্ছিল ঘর থেকে বেরিয়ে। নবীন বললে, পালাচ্ছো কেন ? শোনো!

—কি শুনবো ?

ফিরে দাঁড়াল মালা।

নবীন বললে, তুমি আমার স্বভাবের দোষ দিলে কেন ?

মালা বললে, আপনি অমন বাঁকা-বাঁকা কথা বলছিলেন কেন ?

নবীন বললে, বাঁকা-বাঁকা কথা ? বলেই সে হো হো করে হেসে উঠলো—সে আবার কেমন ?

মালা এবার সত্যি সত্যিই গম্ভীর হয়ে উঠলো। বললে, জানেন সবই, বুঝেন সবই, তবু কেমন না-জানবার না-বুঝবার ভান করছেন। আমার বাবা ওই তো ক্ষ্যাপা-কালা মানুষ, ভাল-মন্দ বোঝে না। আপনাদের আশ্রয়েই আছি। তবু আমরা যে কত গরীব, বাবা যে আমার বিয়ে দিতে পারবে না—সেকথা সবাই জানে, জানেন না শুধু আপনি।

এই কথা বলতে বলতে মালার বড় বড় চোখ দুটি জলে টলটল করে উঠলো।

নবীন বললে, চোখে অমনি জল এসে গেল? মেয়েরা কি শুধু কাঁদতেই জানে?

মালা কোনও কথা বললে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

নবীন বললে, তোমার বিয়ের সব খরচ যদি আমি দিই, বিয়ে করবে?

মালা বললে, দোহাই আপনার! সে-চেষ্টা আর করবেন না। বিয়ে আমি করব না।

নবীন বললে, এ-রকম কথা কিন্তু অনেক মেয়েই বলে, শেষ পর্যন্ত রাখতে পারে না।

—ক'টা মেয়ে দেখেছেন আপনি? আপনার স্ত্রীকে দেখেছেন, আর দেখেছেন আপনার গোমস্তার মেয়েকে!

নবীন বললে, ভুল বললে। আমার স্ত্রীকে আমি এখনও দেখিনি।

মালা জিজ্ঞাসা করলে, বিয়ে করেননি এখনও?

নবীন বললে, না। মনের মত মেয়ে পাচ্ছি না।

কথাটা শুনেই মালা চট্ করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

নবীন বললে, বা-রে, আমি একা বসে থাকবো বুঝি?

এই বলে সে উঠে দাঁড়ালো। ডাকলে, মালা!

ওদিকে ভৈরব তার পোষ্টাপিসের কাজ সেরে ছুটতে ছুটতে কাছারি-বাড়ীতে গিয়ে হাজির!

গিয়েই ডাকলে, সতীশ রয়েছ?

কালা মানুষ একটু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলে। ভাবে, তার মত বুঝি সবাই কালা।

ডাক শুনে সতীশ বেরিয়ে এলো উঠোনে। তার পিছু পিছু সতীশের স্ত্রীও এসে দাঁড়ালো দোরের পাশে।

ভৈরব বললে, বিপিন আজ রইলো আমার বাড়ীতে। সেই কথা বলতে এলাম।

সতীশ বললে, বিপিন কে?

ভৈরব ভাবলে সতীশ তার সঙ্গে রসিকতা করছে। একটু হেসে বললে, বিপিন—বিপিন, তোমার মুনিব। আমাদের জমিদারের ছেলে।

সতীশ বললে, ওর নামও জানো না? বিপিন নয়—নবীন।

—বিপিন উপীন একই কথা বাবা। আচ্ছা বেশ নাহয় উপীনই বলছি।

পেছন থেকে সতীশের স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠলো, আঃ, কার সঙ্গে চেঁচাচ্ছো। কি বলতে চায় ভাল করে শোনো। শুনে বিদেয় করে দাও।

ভৈরব বললে, উপীন বলছে, তাকে নাকি এখানে থাকতে হবে দিনকতক। তাই বলতে এলাম যে, সে আমার ওখানেই থাকবে। ওর বাবার সঙ্গে আমার ভাব-ভালবাসা ছিল তো—

—কী ভাব-ভালবাসার মানুষটি!

ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো সতীশের স্ত্রী।

একটুখানি এগিয়ে এসে আবার বললে, বুঝতে পেরেছ ব্যাপারটা? বাড়ীতে অত বড় আইবুড়ো মেয়ে—বিয়ে দিলে তিন ছেলের মা হতো। সেই তারই সঙ্গে জুটিয়ে দিতে চায়। সুবিধে পেয়েছে, ছাড়বে কেন?

'সুবিধে' কথাটি মাত্র ভৈরব শুনতে পেলে। বললে, না না সুবিধে-অসুবিধের কোনও কথাই সে বলেনি।

সতীশের স্ত্রী বললে, আ-মর্ মুখপোড়া! কি কথার কি জবাব দিচ্ছে ছাখো। তুমি যে কোনও কাজেরই নও।

পশুপতি তামাক খাচ্ছিল বারান্দায় বসে বসে। শ্বশুর-শাশুড়ীকে আসতে দেখে বসে বসেই একটু সরে গেল একট

চেয়ারের আড়ালে। ভৈরব সেইদিকে হাত বাড়ালে। বললে, দাও হুঁকোটা। অনেকক্ষণ থেকে পড়্ পড়্ করে টানছো—

এই বলে হুঁকোটা তার হাত থেকে একরকম কেড়েই নিলে ভৈরব। কেড়ে নিয়ে টানতে লাগলো।

এতক্ষণ পরে শাশুড়ীর নজর পড়লো জামাইএর দিকে। বললে, ওই তো বুড়ো-হাব্ড়া একটা ঘাটের মড়াকে ধরে এনে মেয়ের বিয়ে দিলে, আর কপাল দ্যাখো এই কালা-মিনষের! মরছিল পূজো করে—দু'দিন বাদেই হয়ত শুনবে জমিদারের শ্বশুর হয়ে দিব্যি পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে বসে খাচ্ছে।

কথা শুনতে না পাক্, ভৈরব বুঝতে পারলে সতীশের স্ত্রী কি যেন বলছে। হুঁকোটা টানতে টানতেই সতীশের দিকে তাকিয়ে ভৈরব জিজ্ঞাসা করলে, কি বলছে তোমার বৌ? আমি কিছু শুনতেও পাচ্ছি না, বুঝতেও পারছি না।

সতীশের বৌ বললে, যাক্ আর শুনেও কাজ নেই, বুঝেও কাজ নেই। ওকে বল যে তুমি যাবে বাবুর কাছে। বলে বিদেয় করে দাও।

কিছু বলবার দরকার হলো না। হুঁকোতে ভাল ধোঁয়া বেরুচ্ছিল না। ভৈরব প্রাণপণ চেষ্টা করেও পারলে না ধোঁয়া বের করতে। তখন হুঁকোটা সে পশুপতির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললে, ধর। এতে আর কিছু নেই।

বলেই সে সতীশের দিকে তাকিয়ে বললে, চলি।

সতীশ বললে, হ্যাঁ, যাও।

ভৈরব চলে যেতেই সতীশের স্ত্রী বললে, ওর মেয়েটা তো দেখতে শুনতে ভাল। তার ওপর বাবু আমাদের এখনও বিয়ে-থা করেনি। মুণ্ডুটি ঘুরে যেতেই-বা কতক্ষণ!

বলেই সে পেছন ফিরলো। ফিরেই দেখে—বড় বৌ সুধা দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটাকে কোলে নিয়ে। অনেকক্ষণ আগেই সে এসে দাঁড়িয়েছে।

সুধার কোল থেকে ছেলেটাকে কেড়ে নিয়ে শাশুড়ী বললে, থাক্, আর মায়া বাড়াতে হবে না। বাবুকে তাড়ালি তো এখান থেকে ?

সুধা বললে, আমি তাড়ালাম ?

—তুই তাড়ালি না তো কে তাড়ালে ? দিন নেই রাত নেই, চব্বিশ ঘন্টা ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ ক'রে কাঁদলে মানুষের ভাল লাগে ?

এই বলে শাশুড়ী চলে গেল বাড়ীর ভেতর, শ্বশুর চলে গেছে বাইরে, একা পশুপতি শুধু সেই চেয়ারটার পাশে বসে আবার নতুন করে তামাক সাজছে।

সুধা এলো পশুপতির কাছে। বললে, ওপরের ঘরটায় তালা বন্ধ করে দিয়ে আসি। বাবু আসবেন না।

পশুপতি মুখ তুলে তাকালে। বললে, ভৈরবের মেয়ে মালাকে তুমি দেখেছ ?

সুধা বললে, নিশ্চয় দেখেছি।

—বেশ জাঁদরেল্ মেয়ে, না ?

সুধা বললে, জাঁদরেল্ কথাটার মানেটা ঠিক আমার জানা নেই।

পশুপতি বললে, জাঁদরেল মানে—বেশ ইয়ে আর কি ! লম্বা চওড়া বেশ ডাগর-ডোগর, মানে ওই-বয়সের মেয়েদের যেমনটি ঠিক হওয়া উচিত।

কথাটা এমনভাবে সে বললে, মুখ-চোখের এমন ভাবভঙ্গী করলে, মনে হলো, লোভ যেন তার সর্বাঙ্গ দিয়ে ঠিকরে পড়ছে।

এই লোকটির সামনে দাঁড়ানোও বিপজ্জনক। দু'একটা উলটো-পাল্টা কথা বলা ছাড়া সুধার সঙ্গে ব্যবহার সে কোনদিন খারাপ করেনি। হাসি-রহস্যের সম্পর্ক, কাজেই সুধাও নিজের সম্মান এবং দূরত্ব বজায় রেখে তার সঙ্গে এতদিন হাসি-রহস্যই করেছে। লোকটিকে দয়ার পাত্র বলেই মনে হয়েছে তার। কিন্তু

আজ তার মনে হলো—সে যেন কেমন একটুখানি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

পৃথিবীর যাবতীয় যুবতী নারী তার কাছে শুধু উপভোগ্যা—শুধু রমণীয়া। জীবনে সে-সুযোগ তার এসেছে বহুবার। এখনও যিনি তার শয্যাসঙ্গিনী—বর্ষার পরিপূর্ণ নদীর মত তিনি উদ্দাম-যৌবনা। তবু এখনও—জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও সে জৈব ক্ষুধা তার অতৃপ্ত। ভাল বোধ করি সে কাউকে বাসেনি, কাজেই কোনও নারীর স্বেচ্ছানিবেদিত দেহ-অর্ঘ্য থেকে সে চিরদিন বঞ্চিত। এবং তার অবশ্যম্ভাবী অভিশাপ আজ সে বহন করে চলেছে তার সর্ব দেহমনে। সেই দেহসর্বস্ব পশুপতির দেহ আজ অশক্ত, ইন্দ্রিয় শিথিল। তাই আজ পূর্ণযৌবনা মহিমময়ী নারীমাত্রেই তার উপহাসের পাত্রী। ক্ষুধাজর্জর অতৃপ্ত মন তার অশান্ত চঞ্চল।

শক্ত কথা বলে বেচারাকে আঘাত দিতে সুধার ইচ্ছা হলো না। শুধু বললে, মালা যেমনই হোক, তাতে আপনার কি ?

—আমার আর-কি !

পশুপতি বললে, আমি আমাদের বাবুর কথা বলছি। শাশুড়ী-ঠাকরণ ঠিকই বলেছেন। ঝাপ্‌টা-ঝাপটি চলবে।

হাসিটা প্রাণপণে চেপে সুধা বললে, ঝাপ্‌টা-ঝাপটি চলবে কেন ?

মনের মত কথা পেয়ে পশুপতির তামাক খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। বললে, মালাকে তুমি ঠিক চেনো না তাহলে। সহজে ধরা দেবার মেয়ে সে নয়। তা যদি হ'তো—ওই তো ক্ষ্যাপা-কালা বাপ্‌—টো টো করে বাইরেই ঘুরে বেড়ায়—গাঁয়ের ছোঁড়াগুলো যে-রকম বজ্জাত, ওকে টেনে ছিঁড়ে একেবারে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলতো।

টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলবার যে অভিব্যক্তি সে তার দু'টি হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলে, তা' দেখে সুধা আর হাসি চাপতে পারলে না।

হাসতে হাসতে বললে, গাঁয়ের ছেলেদের সঙ্গে আপনিও ছিলেন নাকি?

পশুপতি বললে, থাকবার জো আছে? নতুন পুকুরের ঘাটে নিতাইএর হাতে এমন কামড় কামড়ে দিলে যে, তার ঘা শুকোতো ছ'মাস লাগলো। তাই না শুনে হাবা গিয়েছিল একদিন তাদের বাড়ীতে। ভৈরব বেরিয়েছে চিঠি বিলি করতে, বাড়ীতে কেউ নেই, মালা একা বসে বসে রান্নাঘরে কি যেন করছিল, হাবা চুপি চুপি গিয়ে পেছন থেকে তাকে জাপ্‌টে ধরে চিৎ করে ফেলেছিল মাটির ওপর। মালা ধাঁই করে মেরে দিলে জোড়া পায়ের এক লাথি। উলটে পড়ে গেল হাবা। তক্ষুনি সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাবা এগিয়ে এলো মালার দিকে। কিন্তু আশ্চর্য মেয়ে বাবা, হাবার মত গুণ্ডাকে দিলে জব্দ করে।

সুধা জিজ্ঞাসা করলে, কেমন করে জব্দ করলে?

—হাবা কি কাউকে বলেছে সেকথা? সে তো সোজা চলে গিয়েছিল কলকাতা। ওই মালাই চেঁচিয়ে-মেচিয়ে লোক জড়ো করে হাট গোল-বাট্‌গোল করে দিলে। বললে, এগিয়ে আসতেই মেরেছি এক ঘুষি। সঙ্গে সঙ্গে নাক দিয়ে গল্‌ গল্‌ করে রক্ত বেরিয়ে আসতেই কাপড় দিয়ে নাকটা চেপে সে পালিয়ে গেল।

এতটা না জানলেও মালা সম্বন্ধে ছোটখাটো এরকম দু'একটা গুজব সুধার কানেও এসেছিল। মালা তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তবু কোনোদিন সে তাকে এ-সব কথা কিছু বলেনি। সুধাও কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। বাড়ীর বৌ হলে কি হবে, পাড়াগাঁয়ের কথা চাপা থাকে না বড়-একটা। এ-কান সে-কান হতে হতে ছড়িয়ে পড়ে সব জায়গায়।

সুধা বললে, ভালই হবে। মালা আমাদের বাবুর বৌ হলে বন্দুক চালাতে শিখবে। তখন আর কারও ট্যাঁ-ফোঁ করবার ক্ষমতা থাকবে না।

পশুপতি হেসে উঠলো। বললে, অতবড় একটা জমিদার, ওই পূজোরীর মেয়েটাকে বিয়ে করবে? না করলেই নয়। গরীব মানুষ, বাপের হাতে শ'খানেক্ টাকা গুঁজে দেবে, মেয়েটাকেও দেবে কিছু—বাস্!

নবীন সম্বন্ধে এ-মন্তব্য সুধার খুব খারাপ লাগলো। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না। 'তালাটা বন্ধ করে আসি' বলে দোতলায় উঠে গেল।

পশুপতি টিকে ধরিয়ে তামাকটা তখন সবে টানতে আরম্ভ করেছে, এমন সময় জুতোর শব্দে মুখ তুলে তাকাতেই দেখে, বন্দুক হাতে নিয়ে নবীন ঢুকছে কাছারিতে।

পশুপতি বলে উঠলো, জিনিসপত্র কিছু ফেলে গেছেন বুঝি?

নবীন বললে, কই না তো, কেন?

—আবার ফিরে এলেন কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করছি। রাত্রে যাবেন বুঝি?

নবীন তার কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারছিল না।

বললে, কোথায়?

পশুপতি বললে, ভৈরবের বাড়ীতে। ওইখানেই থাকবেন শুনলাম।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, কে বললে?

পশুপতি বললে, ভৈরব নিজে এসে বলে গেল।

—তাই নাকি?

বলেই ফাঁকা চেয়ারটার ওপর নবীন বসতে যাচ্ছিল, পশুপতি হাঁ হাঁ করে নিষেধ করলে। বললে, ওখানে কেন? একেবারে ওপরে আপনার ঘরে গিয়েই বসুন।

এই বলে চোখ-মুখের একটা বিশ্রী রকমের ইঙ্গিত করে বললে, গেছে। ওপরের ঘরেই আছে।

—কে আছে?

—আপনার সুধা।

বলেই নির্বিকার ভাবে হুঁকোটা টানতে লাগলো পশুপতি।

তার এই অভদ্র ইঙ্গিতটা নবীনের সর্বশরীরে জ্বালা ধরিয়ে দিলে। কিন্তু সভ্যতা মানুষকে এইরকম অনেক জ্বালাই নীরবে সহ্য করায়। নবীন কি করবে কিছু বুঝতে পারছিল না। এক পা এগিয়ে গিয়ে ওপরের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলে সিঁড়ির ওপর সুধা দাঁড়িয়ে আছে।

সবই সে শুনেছে বোধ হয়।

কিন্তু সব-কিছু শুনেও সুধা ডাকলে, আসুন। দোরে তালা বন্ধ করেছিলাম। খুলে দিচ্ছি।

নবীন ওপরে উঠে গেল।

সুধার কাছে গিয়ে আঙুল বাড়িয়ে পশুপতিকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, লোকটা ভারি ইতর।

—সেকথা কি এখন টের পেলেন ?

সুধা ঘরে ঢুকে বললে, দেশলাইটা দিন। আলো জ্বালি। ঘরটা এক্ষুনি অন্ধকার হয়ে যাবে।

বন্দুকটা নামিয়ে নবীন তার পকেট থেকে দেশলাই বের করে ছুঁড়ে দিলে সুধার গায়ের ওপর।

মদনপুর—ঝিলিমিলি থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে একটি গ্রামে পুলিশের থানা। পরের দিন সকালে এই গ্রামেরই একজন দফাদার এলো সতীশের কাছে। থানার দারোগাবাবু সতীশকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এক্ষুণি যেতে হবে।

সতীশ নবীনের কাছেই বসেছিল। বললে, দেখুন আবার কোথায় কি ঝামেলা বাধলো। আপনারা ভাবেন গোমস্তার কাজ

করছে—ব্যাটা খুব আরামে আছে। কিন্তু এইরকম ঝামেলা আমাকে হরদম পোয়াতে হয়।

এই বলে সতীশ তার কোটের ওপর একটা ময়লা চাদর ফেলে দিয়ে, পান খেয়ে একটি লাঠি হাতে নিয়ে শ্রীদুর্গা শ্রীদুর্গা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

ভেবেছিল ফিরে এসে নবীনকে তার চাকরির দায়িত্বটা বেশ ভাল করেই বুঝিয়ে দেবে। কিন্তু বিধাতা বাদ সাধলেন।

সতীশ একা ফিরে এলো না। সঙ্গে এলো তার বড় ছেলে ফকির, ফকিরের এক শালা—অর্থাৎ ফকির দ্বিতীয়বার যে-মেয়েটিকে বিয়ে করে এনেছে, তার এক দাদা, একজন কনেষ্টবল আর একজন দারোগা।

গ্রামে ঢুকতেই সে এক হৈ চৈ ব্যাপার।

ব্যাপারটা যার নজরে পড়েছে সে-ই পিছু নিয়েছে।

খবরটা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয়নি, এবং তার অনিবার্য ফল হয়েছে এই যে, সতীশ যখন কাছারি-বাড়ীতে এসে পৌঁছেছে তখন তার পিছু পিছু সারা গ্রামখানাই একরকম ভেঙ্গে পড়েছে।

একজন কনেষ্টবলের পক্ষে প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠলো ভিড় সরানো। তাই গ্রামের চৌকিদার, দফাদার সবারই ডাক পড়লো এই অপ্রীতিকর কাজটি করবার জন্য।

সতীশের এই ফকির ছেলেটিকে গ্রামের সকলেই বেশ ভাল করে চেনে, কিন্তু আজ আবার এমন কী ব্যাপার ঘটলো যার জন্যে পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে এলো—সেই কথাটাই সকলে জানতে চাইলে।

দারোগাবাবু দেখলেন—জানাতে হলে এখান থেকে নড়তে চাইবে না কেউ। এটা হলো এনকোয়েরীর ব্যাপার। তাই তিনি হাত জোড় করে বললেন, দয়া করে আপনারা আমাকে একটু

সাহায্য করুন। ব্যাপার কিছুই নয়। ফকিরবাবু একটা চাকরির দরখাস্ত করেছেন। তারই এন্‌কোয়েরী করতে এসেছি আমি।

কথাটা যদিও কেউ বিশ্বাস করলে না, তবু ভদ্রতার খাতিরে ভিড় কিছু পাতলা হয়ে গেল।

নবীন গোলমাল শুনে নেমে এসেছিল নীচে। দারোগাবাবুদের ভেতরে ঢুকিয়ে কাছারির সদর দরজায় খিল বন্ধ করে দিলে।

ওদিকে বাড়ীর দরজায় তখন মেয়েরা এসে দাঁড়িয়েছে।

চেয়ার টেনে দিয়ে সতীশ বসালে দারোগাবাবুকে। তারপর নবীনের কাছে গিয়ে বললে, দেখুন বাবু, আমার ছেলেকে কিরকম একটা মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে ফেলেছে। —ও বাবা ফকির, প্রণাম কর বাবুকে।

সতীশের বড় ছেলে ফকির—সুধার স্বামী। নবীন দেখলে তাকে ভাল করে। পরণে খাঁকি কাপড়ের ফুল প্যাণ্ট, গায়ে হাত কাটা বুশ-সার্ট। মাথার চুলগুলো বার-বার তার কপালে এসে পড়ছে আর পকেট থেকে ছোট একটা চিরুণী বের করে বার-বার সেই অবাধ্য চুলগুলোকে ঠিক করে নিচ্ছে। দাঁড়িয়েছিল দেয়ালে ঠেস দিয়ে। পিতৃবাক্য অবহেলা করবার নয়, তাই সেইখান থেকেই হাত দুটি কপালে ঠেকিয়ে নবীনকে একটি নমস্কার করলে।

তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের আর-একজন ছোকরা ফকিরের পায়ের কাছে মেঝেতে বসে পড়লো। নবীন বললে, আপনি ওখানে বসলেন কেন? কে আপনি?

সতীশ বললে, ফকিরের শালা।

দারোগাবাবু হাসলেন একটুখানি। নবীন সেটা লক্ষ্য করলে। জিজ্ঞাসা করলে, হাসলেন যে?

দারোগাবাবু বললেন, খুব নোংরা ব্যাপার মশাই। আপনিই এখানকার জমিদার?

নবীন হেসে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, জমিদার এখনও আছি। তবে আর বেশিদিন থাকবো না।

জমিদারী উঠে যাবে—দারোগাবাবু জানেন। তাই তিনিও হাসলেন।

সতীশ এগিয়ে এলো। বললে, বাবু নীলকণ্ঠ মুখুজ্যের ছেলে, বি-এ পাশ। মস্ত বড়লোক—

নবীন তাকে থামিয়ে দিলে। বললে, থাক্, থাক্, আর বলতে হবে না। উনি জানেন।

সতীশ থামবার ছেলেই নয়। বললে, না না উনি জানেন না। উনি নতুন এসেছেন। এ তল্লাটে, বুঝলেন কিনা, অনেকগুলো গ্রাম—মানে বিরাট জমিদারী—

এবার বোধকরি দারোগাবাবুরও সহ্য হলো না। বললেন, আপনি থামুন সতীশবাবু, আমার অন্য কাজ আছে।

নবীন দারোগাবাবুর দিকে তাকালো। পকেট থেকে সিগারেট বের করে তাঁর হাতে একটি সিগারেট দিয়ে নিজেও একটি ধরিয়ে বললে, বলুন এবার, ব্যাপারটা কি শুনি।

দারোগাবাবু বললেন, সতীশবাবুর ছেলে ফকির কলকাতা থেকে একটি মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে।

নবীন বললে, মেয়েটিকে ফকির তাহ'লে বিয়ে করেনি ?

দারোগা বললেন, কি জানি মশাই, বলছে তো তাই। এখন প্রমাণ করুক আদালতে গিয়ে। আমাদের কাজ—আমরা রিপোর্ট দিয়ে হাজির করে দেবো আদালতে।

এই বলে দারোগাবাবু সতীশের দিকে তাকিয়ে বললেন, ডাকুন সেই মেয়েটিকে—আপনার ছোট বৌমাকে।

ডাকবার দরকার হলো না। সবাই এসে দাঁড়িয়েছিল বাগানের একটা গাছের নীচে। আসেনি শুধু সুধা।

ফকির কিন্তু আর চুপ করে থাকতে পারলে না। মাথার

চুলটাকে আর-একবার ঠিক করে নিয়ে বোধকরি নবীনের কাছাকাছি একটু এগিয়ে এসে বললে, বিশ্বাস করবেন না স্যার, অল্ ফল্‌স্, অল্ বোগাস্।

দারোগাবাবু বললেন, চুপ কর। চুপ কর।

ফকির বললে, হোয়াই চুপ করব স্যার? ইন দিই টেম্‌পেল্ অভ গডেস্ কালী, উই গেভ ফ্লাওয়ার-নেক্‌লেস্ টু ইচ্-আদার। মি টু সি, সি টু মি।

ফকিরের ইংরেজি শুনে নবীনের বেশ মজা লাগল। বললে, তাই নাকি? মা-কালীর মন্দিরে গিয়ে দুজনে মালা বদল করেছ?

ফকির গম্ভীর হয়ে বললে, ইয়েস্ স্যার।

দারোগাবাবু বোধকরি একটুখানি রসিকতা করলেন। বললেন, বেশ ইংরেজি বলে। আর বেশ গড় গড় করে বলে যায়।

ফকির বললে, শিখতে হয়েছে স্যার। আমাদের কাষ্টোমার সব ইওরোপিয়ান, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান—

নবীনের ঔৎসুক্য বেড়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলে, কি কাজ কর তুমি?

ফকির বললে, অটোমোবাইল্ ইঞ্জিনিয়ারিং।

—তার মানে কলকাতার কোনও মোটরগাড়ীর কারখানায় কাজ কর?

ফকির বললে, ইয়েস স্যার।

বলেই তার আবার একবার প্রয়োজন হলো মাথার চুলগুলো ঠিক করে নেবার। পকেট থেকে চিরুণীটি বের করে মাথাটা আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললে, সায়েব-পাড়ার অল্ দি মোটর ওয়ার্কশপ—নো মি ইন্ ওয়ান কল্। এক ডাকে চেনে স্যার।

—বটে?

—হ্যাঁ স্যার।

চিরুণীটি বুকের পকেটে রাখলে ফকির। রেখেই আবার

আরম্ভ করলে, অষ্টিন, মরিস, রোভার, সিঙ্গার—ষ্টুডি, ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ডজ্, হাম্বার—এনি কাইণ্ড্ এনি রিপেয়ার—কল্ ফকির-মেকানিক্! বাস্!

বলেই ডান হাতের ছুটি আঙুলে পট্ করে একটা আওয়াজ করে বললে, দেন্ এণ্ড দেয়ার! ক্যাচিং মিস্টেক্ বাই দি আওয়াজ অভ এ গাড়ী, ইজ নট্ এ চারটিখানি কথা স্যার। একটা বুড়ো মিস্ত্রি আছে হপ্‌কিন্‌স্ গ্যারাজে, সে পারে আর আমি পারি।

অবাক্ হবার ভাণ করে নবীন এমনভাবে তাকালে ফকিরের দিকে যে ফকির আরও বেশি উৎসাহিত হয়ে আবার বললে, আই ক্যান্ টেল ইন দি টপেষ্ট্ অভ মাই ভয়েস্—ইফ এনি ব্রাদার-ইন-ল ক্যান্ ডু ইট্, আই স্যাল্ টেক সেভেন স্থুজ্ অন্ মাই হেড।

হঠাৎ তাদের পেছন থেকে একটি নারীকণ্ঠের আওয়াজ শুনে সবাই সেইদিকে তাকালে—

মেয়েটি বলে উঠলো: ফুটানি মারবার আর জায়গা পাও নাই?

সতীশ বললে, এই তো আমার ছোট-বৌ!

ফকির কট্‌মট্ করে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললে, স্যাট্ আপ্!

মেয়েটি এগিয়ে এলো। বললে, রাখো তোমার চোখ-রাঙানি!

নবীন অবাক হয়ে গেল এদের কথাবার্তা শুনে।

নবীন ভেবেছিল, মন্ত্র পড়ে বিয়ে না হোক্, কালীমন্দিরে মালাবদল করে যে-মেয়ে স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করে এসেছে, ফকিরের সঙ্গে তার সম্বন্ধটা অন্তত প্রীতির সম্বন্ধ নিশ্চয়ই। কিন্তু মেয়েটির কথা বলবার ধরন আর চোখমুখের ভাবভঙ্গী দেখে এদের দু'জনের মধ্যে বিন্দুমাত্র ভাব-ভালবাসা আছে বলে তো মনে হয় না।

নবীন মেয়েটির দিকে এতক্ষণ ভাল করে তাকাতে পর্যন্ত পারেনি। এবার তার অত্যন্ত কৌতূহল হলো। দেখলে মেয়েটিকে। সুন্দরী তাকে কোনোরকমেই বলা চলে না। গায়ের রং ফর্সা নয়।

চেহারার মধ্যেও কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। শুধু তার সারা দেহে রয়েছে বন্য যৌবনের একটা দুর্দ্দান্ত আকর্ষণ।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, এই যদি তোমাদের সম্বন্ধ তো তুমি এলে কেন?

মেয়েটি বললে, ওর যে ছেলে আছে বৌ আছে—তা তো আমাকে বলে নাই মিথ্যাবাদী।

নবীন এবার দারোগাবাবুর দিকে তাকালে। বললে, ওর বাড়ীর লোক জানতো না নিশ্চয়ই।

দারোগাবাবু বললেন, না মশাই, ও-ই তো ওর দাদাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে এখান থেকে।

মেয়েটি বললে, হ্যাঁ চিঠি লিখেছি। লিখেছি তো! লিখব না? ও আমাকে বলে কিনা বেশি তিড়িং বিড়িং করবা তো কাট্যা পুঁতে ফেলবো।

ফকির চেঁচিয়ে উঠলো, কে বলেছে? হু? হু সেড্ ইট?

বৌ বললে, থামো থামো, আর ইঞ্জিরি ফলাতে হবে না। বল নাই—তোমরা বড় জমিদার? বল নাই—তোমাদের জমিজমা আমার নামে লিখে দেবে? এখানে এসে দেখি—সব বাজে কথা। খেটে খেটে মরে গেলাম, পরণের একটা কাপড় দেবার মুরোদ নাই —ওরে আমার সোয়ামী রে! মুখে আগুন! মুখে আগুন অমন হতচ্ছাড়া পুরুষ মানুষের!

সর্বনাশ! নবীনের সব-কিছু যেন গোলমাল হয়ে গেল। একবার ফকিরের মুখের দিকে তাকালে সে। চোখ-মুখ তার লাল হয়ে উঠেছে। সেও বোধকরি এতখানি আশা করতে পারেনি।

ঐহিক সুখসৌভাগ্যের একটা মিথ্যা প্রলোভন আর পাশবিক একটা জৈবপ্রবৃত্তির অন্ধ উন্মাদনা—এই ছিল এদের একমাত্র মূলধন। তাই দিয়েই এদের কারবার এরা বেশ চালিয়ে নিয়ে যেতে পারতো। রক্তবীজ ছড়িয়ে ছড়িয়ে অবাঞ্ছিত আগাছার চাষ এরা

মন্দ চালাতো না এদেশের মাটিতে। কিন্তু বিধাতা বাদ সাধলেন। নির্বোধ মেয়ে রাগের মাথায় একটি চিঠি লিখে বসলো।

এই প্রসঙ্গে সুধার কথাটাও একবার সে ভেবে দেখলে। এখানে সে একেবারে অপ্রয়োজনীয়। তার স্থান এখানে হতেই পারে না। কেমন করে এতদিন হয়েছিল সেইটিই আশ্চর্য।

ফকিরের এই মালাবদলকরা স্ত্রীটি হঠাৎ ডেকে উঠলো, দাদা! ওখানে অমন চুপ করে বসে আছ কেন? ভাত-টাত খাবে তো?

এই বলে সে এগিয়ে যাচ্ছিল তার দাদার কাছে। পেছন থেকে হঠাৎ তার শাশুড়ী হাঁক দিলে, বৌমা, শোনো!

দারোগাবাবু বললেন, দাঁড়ান মা, ওঁকে আমার কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে।

—বলি হ্যাঁগা মেয়ে, তোমাকে যে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

মেয়েটি ফিরে দাঁড়ালো। বললে, কেন?

দারোগাবাবু বললেন, তোমার দাদা নালিশ করেছেন। বলেছেন—ফকিরবাবু তোমাদের বাড়ী থেকে তোমাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেছেন। এতদিন পরে তোমার চিঠিতে খবর পেয়েছেন—তোমাকে নাকি এইখানে আটকে রাখা হয়েছে।

মেয়েটি বললে, আমি কচি খুকি, তাই আমাকে আটকে রাখবে! আটকে রাখবার মুরোদ কত!

এই বলে মেয়েটি একবার ফকিরের দিকে তাকালে। তারপর কেমন যেন একটা ঠোঁট-চাপা দুষ্টু হাসি হেসে বললে, কেমন জব্দ!

নবীন তার চোখটাকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। ভুল দেখলে না তো?

পরক্ষণেই মেয়েটি তার সব ভুল ভেঙ্গে দিলে। তার দাদার দিকে তাকিয়ে বললে, দাদার যেমন আক্কেল! একেবারে পুলিশ দারোগা নিয়ে চলে এলো!

দাদা এতক্ষণ পরে কথা বললে।

—চিঠি তুই লিখিস নাই ?

মেয়েটি বললে, হ্যাঁ, লিখেছিলাম। লিখেছিলাম, "কতদিন আমার খবর পাও নাই। ভাবছো বুঝি মরে গেছি। আমি মরি নাই। এইখানে আছি।" তারপর এই মানুষটার ঠিকানা দিয়ে বলেছিলাম, "ওইখান থেকে ওকে ধরে নিয়ে এখানে এসো। আমাকে দেখতে পাবে। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।" এই তো লিখেছিলাম।

দাদা বললে, বেশ তাহ'লে আমার সঙ্গে তোর কি কথা আছে তাই বল্।

বোনটি তার মুখের ওপর ভেংচি কেটে বললে, আ-মরি-মরি! ভূত কোথাকার! এই এক-হাট লোকের সামনে আমি বলি!

দারোগাবাবু বললেন, হ্যাঁ মা, বলতে হবে। উনি নালিশ যখন করেছেন, আর আমি যখন এসেছি, তখন সব কথাই তোমাকে খুলে বলতে হবে। বল তুমি ওঁকে কি বলতে চেয়েছিলে।

মেয়েটি মাথা নীচু করলে। এতক্ষণ পরে মনে হলো যেন ওরও লজ্জা বলে একটা বস্তু আছে। গলার আওয়াজটা একটু খাটো করে বললে, আমার ছেলে হবে।

নবীন মুখ টিপে একটু হেসে দারোগাবাবুর মুখের দিকে তাকালে। দেখলে, দারোগাবাবুও তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

নবীন বললে, এবার ওই দাদাটিকে বলুন, মামলা তুলে নিক্।

দারোগাবাবু চুপি চুপি বললেন, মেয়েটির বয়স কত হবে?

নবীন বললে, যতই হোক, না-বালিকা নয়।

ব্যাপার দেখে একেবারে হাবা হয়ে গেছে নবীন।

মানুষের অন্তরতম চরিত্রটি ঠিকই থাকে, কিন্তু কী অপূর্ব তার লীলা-বৈচিত্র্য! জীবনের আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা চলে।

ছেলেটার মায়া যদি পরিত্যাগ করতে পারে তো সুধার এখান থেকে চলে যাবার আর কোনও বাধা নেই। তার নিজেরও এখানে থাকবার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। কাজেই সুধাকে একটা কথা বলবার জন্য নবীন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। ভেবেছিল—দুপুরে খাবার সময় জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু পশুপতি তার সঙ্গ ছাড়ছে না কিছুতেই। তার ধারণা—এত বড় একটা মামলা থেকে ফকির যে নিষ্কৃতি পেয়ে গেল, এ শুধু নবীনের কারসাজি। নবীনই দারোগাবাবুকে বলে-কয়ে এই কাণ্ডটি করেছে।

ফকির ছাড়া পাওয়ায় পশুপতির দুঃখের আর সীমা নেই। দারোগাবাবু চলে যাবার পর থেকে তার কথা আর থামছে না কিছুতেই। কখনও গাছের তলায়, কখনও কাছারির বারান্দায়, কখনও রান্নাঘরে, কখনও-বা নবীনের কাছে গিয়ে অনবরত বকে চলেছে।

—আমি তোর ভগ্নিপতি, তুই আমার নাতীর বয়সী, তোকে বলেছি শুধু—কাজটা তুই ভাল করিসনি ফকির। তার জবাবে বললি কিনা—সাট্‌আপ্‌ ইউ ওলড্‌ ফ্‌ল! এইটে কথার মতন কথা? ভাগ্যিস্‌ ছিল ওই নবীন মুখুজ্যে আর তোর ওই বড় বৌটা, তাই এ-যাত্রা বেঁচে গেলি। নইলে তিনটি বচ্ছর তোকে ঘানি টানতে হতো।

খেতে সেদিন দেরি হয়েছিল। স্নান করে আসবার পথে বাগানে পশুপতির সঙ্গে নবীনের মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। কথা না বলে নবীন চলেই-বা আসে কেমন করে? বলেছিল, থামুন না! অত বকছেন কেন?

বাস্‌, আর যায় কোথা? নবীন খেতে বসেছে, সুধাকে দুটো কথা বলবে বলে তৈরি হয়েছে, এমন সময় পশুপতি ঢুকে পড়লো। একটা মোড়া টেনে নিয়ে ভাল করে বাগিয়ে বসে সুরু করলে তার ভাষণ।

—আমাকে থামতে বলছেন? আমি না-হয় থামলাম। কিন্তু দেশ-তুনিয়ার লোক থামবে কি? বলি—তু' পয়সা রোজগার করিস বলে তুই নাহয় করে বসলি একটা কাজ—পুরুষ ব্যাটা-ছেলে, এমন একটা কেন, দশটা কর্, কিন্তু করলি করলি একটু ভেবে চিন্তে করবি না? আচ্ছা আপনিই বলুন নবীনবাবু, তুই নিজে বামুনের ছেলে, যা কিছু করবি বামুনের মেয়ের সঙ্গেই করবি তো! বিশেষতঃ তাকে যখন বাড়ীতে এনে রাখছিস।

নবীন বললে, এ আবার কী কথা বলছেন? মেয়েটি বামুনের মেয়ে নয়?

পশুপতি নির্বিকার চিত্তে বলে বসলো, আজ্ঞে না।

—কেমন করে বুঝলেন? জিজ্ঞাসা করলে নবীন।

পশুপতি বললে, মেয়েদের একটা লক্ষণ আছে—দেখলেই বুঝতে পারি।

নবীন বললে, কি লক্ষণ বলুন না, শিখে রাখি।

পশুপতি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপিচুপি বললে, বামুনদের মেয়ের যৌবন খুব তাড়াতাড়ি গড়িয়ে যায়।

সুধা কাছাকাছি রয়েছে দাঁড়িয়ে। কথাটা শুনতে পেলে কিনা কে জানে। নবীন বললে, ভাল। মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার এই অদ্ভুত আবিষ্কারের কথা জেনে রাখলাম। কাজে লাগবে।

পশুপতি খুশী হলো। বললে, এ রকম অনেক আবিষ্কার আমার আছে।

নবীন বললে, লিখে রাখবেন নইলে হারিয়ে যাবে। এগুলি আপনার অমূল্য সম্পদ।

নবীন উঠে পড়লো। ভাল করে খেতেও পারলে না।

খাওয়াদাওয়ার পর কাছারির দোতলার ঘরে নবীন আশা নিয়ে বসে রইলো—সুধা আসবে। কিন্তু এলো না।

তবে কি সে আর আসবে না? সব কাজ তার ফুরিয়ে গেছে? হবেও-বা।

মাত্র একটি কথা তাকে জিজ্ঞাসা করবার ছিল।—এখন কী সে করবে? কোথায় যাবে?

সুধার ওপর অভিমান একটু তার হলো বই-কি!

বিকেল পাঁচটায় একটা ট্রেণ আছে ঝিলিমিলি ষ্টেশনে। সেই ট্রেণে চড়লে বাড়ী ফিরতে সাতটা সাড়ে-সাতটা বাজবে। বাড়ী যাবার জন্যে নবীন উঠে দাঁড়াল। যাবার পথে একটিবার সে ভৈরব আচার্য্যের সঙ্গে দেখা করে যাবে। একটুখানি পথ ঘুরে যেতে হবে। তা হোক্।

বন্দুক হাতে নিয়ে ব্যাগটি কাঁধে ফেলে নবীন যেই ঘর থেকে বেরিয়েছে, দেখলে উমা আসছে হাসতে হাসতে তার চা নিয়ে।

উমাকে দেখেই তার ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়ে গেল—সুধা আসবে না। হয়ত-বা তার প্রতি নবীনের দুর্বলতা সে টের পেয়েছে। তাই তার এ লজ্জা। তাই তার এ সঙ্কোচ।

কিংবা হয়ত মেয়ে-জাতটাই একটা হেঁয়ালী। নারী-চরিত্র সত্যই দুর্জ্ঞেয়।

উমা দোরের কাছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। বললে, একি? কোথায় যাচ্ছেন?

নবীন বললে, বাড়ী।

উমা বললে, চলুন ঘরে চলুন। চা-টা খেয়ে যাবেন।

নবীনকে বাধ্য হয়ে ঘরে ঢুকতে হলো। হাতের বন্দুকটা নামিয়ে ইজি চেয়ারে বসে বললে, দাও।

চায়ের কাপটি নামিয়ে দিয়ে উমা জিজ্ঞাসা করলে, আবার কবে আসবেন?

আর সে কখনও এখানে আসবে না—এই শক্ত কথাটা নবীন তাকে বলতে পারলে না। শুধু বললে, তা ঠিক বলতে পারছি না।

বলেই সে একবার মুখ তুলে তাকালে। সেই উমা। সেই অম্লান সুন্দর হাসি!

এখানে আসবার এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যে নবীন বললে, কত্তাটি কি করছেন?

কত্তাটি মানে যে তার স্বামী পশুপতি—এই সহজ কথাটা বুঝতে তার একটু দেরি হলো। চোখ মিট্ মিট্ করে জিজ্ঞাসা করলে, কে? কত্তা কে?

নবীন বললে, তোমার স্বামী—পশুপতিবাবু।

অকারণেই খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো উমা। বললে, ঘুমোচ্ছে।

—তোমার বাবা কি করছে?

—বাবা চা খাচ্ছে। ইষ্টিশনে গিয়েছিল, এই তো এলো। এসেই চা খেতে বসেছে।

নবীন বললে, যাও তোমার বাবাকে একবার পাঠিয়ে দাওগে। যাবার সময় বলে যাই।

বলতে বলতেই ঘরে ঢুকলো সতীশ।

উমা হাসতে হাসতে বলে উঠলো, বাবা, তুমি অনেকদিন বাঁচবে। এই মাত্তর তোমার কথা হচ্ছিল।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, তুমি ষ্টেশনে গিয়েছিলে?

সতীশ বললে, যাব বলেই বেরিয়েছিলাম। কিন্তু বৌমা বললে, আপনি আসবেন না আমার সঙ্গে। লোকে দেখলে যখন জিজ্ঞাসা করবে কোথায় যাচ্ছো, আপনি জবাব দিতে পারবেন না। তার চেয়ে আপনি ফিরে যান, আমি একাই যেতে পারবো।

নবীন বললে, তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না সতীশ। তুমি কাকে নিয়ে যাচ্ছিলে ষ্টেশনে? কে বললে, আমি একাই যেতে পারবো?

সতীশ বললে, আমার বড় বৌমা—বাপের বাড়ী চলে গেল কিনা! তাকেই চড়াতে যাচ্ছিলাম ষ্টেশনে।

সুধা চলে গেছে? চোখের সুমুখে বজ্রপাত হলেও বুঝি এত বিস্মিত হতো না নবীন!

কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভেবে নবীন বললে, একাই গেল—না ছেলেটাকে নিয়ে গেল?

সতীশ বললে, নাঃ, ছেলেটাকে কেড়ে রাখলে আমার স্ত্রী—কিছুতেই দিলে না। এত যে বললাম কিছুতেই শুনলে না।

—যাবার সময় খুব কান্নাকাটি করছিল?

সতীশ বললে, তা একটু করছিল বই-কি!

আর-কিছু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছিল না নবীনের। তবু জিজ্ঞাসা করলে, ক'টার ট্রেণে গেল?

—তিনটের ট্রেণে। এখন বাজছে ক'টা?

নবীন তার হাতের ঘড়িটা দেখে বললে, চারটে পনেরো।

সতীশ বললে, এতক্ষণ পৌঁছে গেছে। সুতোহাটি ষ্টেশনের গায়েই ওদের বাড়ী।

নবীন উঠে দাঁড়ালো। বললে, চলি।

—আজই বাড়ী যাবেন?

—হুঁ। বলে নবীন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

সতীশ তার পিছু পিছু এসেছিল সদর দরজা পর্যন্ত, নবীন তখন রাস্তায় গিয়ে নেমেছে, আর সতীশ দরজা বন্ধ করবার জন্য হাত বাড়িয়েছে, এমন সময় দেখলে, ভৈরব আচার্য্য এসে ধরলে নবীনকে।

—সেদিন কি হলো বলতো? ফট্ করে তুমি চলে এলে আমার বাড়ী থেকে। এসো, আজ আমি তোমাকে ছাড়ব না কিছুতেই।

নবীন একবার পেছন ফিরে তাকালে। দেখলে, সতীশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

—পাকড়াও যখন করছে তখন যেতেই হবে। চলুন!

ভৈরবের পিছু-পিছু নবীন চলে গেল।

সতীশ কাছারির দোরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে শুধু। দেখলে আর তার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল।

॥ ৪ ॥

বাড়ীর উঠোন থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে ঘরে ঢুকলো ভৈরব।

—মালা! মালা! এই ছ্যাখ্, ধরে এনেছি নবীনকে।

মালা তাদের ঘরের চৌকাঠের কাছে একবার মুখ বাড়িয়েই ঘরে ঢুকে পড়ল।

ভৈরব বললে, তুমি বোসো। আমি আমার কাজটা সেরে দিয়েই আসছি। সেদিনকার মতন পালিয়ো না যেন।

নবীন বললে, বেশি দেরি করবেন না। আজই আমি বাড়ী যাব।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! ভৈরব তার নিজের কথাটা শেষ করে নিয়েই পেছন ফিরে বোধকরি পোষ্টাপিসের দিকে চলে গেল।

অগত্যা ঘরে ঢুকতে হলো নবীনকে।

মালা যেন কত কাজে ব্যস্ত!

সন্ধ্যা নামতে তখন দেরি আছে। তবু সে একটা লণ্ঠন তুলে নিয়ে কানের কাছে নেড়ে নেড়ে দেখলে তাতে তেল আছে কি না। তারপর বুঝি আর-একটা লণ্ঠনের খোঁজে পাশের ঘরে যেতে যেতে থমকে থামলো নবীনের সুমুখে। বললে, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।

নবীনের মনের অবস্থা ভাল ছিল না। সুধা তাকে কিছু না বলেই চলে গেল। যাবার সময় একটিবার দেখা পর্যন্ত করে গেল না। —কিছুতেই সে ভুলতে পারছে না কথাটা। তখন থেকে শুধু সেই একই কথা সে ভাবছে আর ভাবছে। এ ভাবনার যেন শেষ নেই। এ বেদনার যেন শান্তি নেই!

নবীন তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে মালা একবার চোখছুটি

তুলে তার দিকে তাকালে। মালার মনে হলো অন্য কথা। ভাবলে বুঝি নবীন তার ওপর রাগ করেছে। মনের দুঃখে কয়েকটা কথা বলতে গিয়ে মালা কাল কেঁদে ফেলেছিল তার কাছে। কেঁদে তাকে একটু রূঢ়ভাবে আঘাত করতেও কুণ্ঠিত হয়নি।

পুরুষ মানুষ মালা অনেক দেখেছে। দেখেছে তাদের একই চেহারা। শুধু এই মানুষটিকেই তার মনে হয়েছিল যেন তা' থেকে স্বতন্ত্র। ভাল লেগেছিল তার। খুবই ভাল লেগেছিল। আর বোধকরি শুধু সেইজন্যেই সে তার মনের নিরুদ্ধ আবেগকে অমন করে প্রকাশ করতে পেরেছিল তার কাছে। নারীর এই নিরাবরণ নির্লজ্জ প্রকাশ কোথায় সম্ভব—সেটুকু বোঝবার মত বোধশক্তি তার নিশ্চয়ই আছে। তবু কেন যে সে এরকম মুখভার করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মালা ঠিক বুঝতে পারছিল না। বললে, আমার ওপর রাগ কি আপনার এখনও পড়েনি?

কথাটা শুনে একটুখানি অবাক হয়ে গেল নবীন। তার ওপর রাগ আবার সে কখন করলে? বরং ঠিক তার উল্‌টোটাই সত্যি।

নবীন বললে, না, রাগ করিনি। আমি বাড়ী যাব বলে ষ্টেশনে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ তোমার বাবা আমাকে—

কথাটা মালা তাকে শেষ করতে দিল না। বললে, জোর করে এইখানে টেনে নিয়ে এলো।—তা' আপনি না এলেই পারতেন। এলেন কেন?

—সত্যিই তো। এলাম কেন?

নবীন চোখ তুলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, কেন এলাম বলতে পারো?

মালাও কম যায় না। বললে, আমাকে দেখবার জন্যে নয় নিশ্চয়ই।

—নয়ই-বা কেন? নবীন বললে, মেয়ে-জোয়ান ব্যাটাছেলে-

দের দাঁত ভেঙে দিতে পারে, তাকে কেউ যদি দেখতে আসে, তাতেই-বা দোষ কি ?

মালা এবার তার কপট গাম্ভীর্য বজায় রাখতে পারলে না। ফিক্ করে হেসে ফেললে। বললে, মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার কৌতূহল তো কম নয় দেখছি! এরই মধ্যে এই সব গল্প জেনে ফেলেছেন ?

নবীন বললে, এমন একটি মানুষের সঙ্গে ছিলাম দুদিন, যার কাছে থেকে তোমার সম্বন্ধে এমন অনেক কথা আমি জেনে ফেলেছি —যা আমার আগে জানা ছিল না।

মালা বললে, লোকটা তো ভারি একচোখো দেখছি! শুধু আমার কথাই বললে ? ও-বাড়ীতে তো আমার বয়েসী অনেকগুলো মেয়ে আছে।

—তুমি যে ওদের চেয়ে একটুখানি আলাদা সে-কথা কি তুমি নিজে জানো ?

মালা বললে, কি জানি দাদা, নিজের সম্বন্ধে অতখানি ভাববার অবসর পাইনি। ছেলেবেলা থেকে দেখছি বাবা করছে গোপালের পূজো, আর আমাকে করতে হয়েছে সেই গোপালের সেবা। তাই সব সময়েই ভয় হয়েছে নিজের দেহ মন যাতে অশুচি না হয়! বিপদে পড়েছি। গোপালকে ডেকেছি। গোপাল আমাকে সাহায্য করেছে। গোপাল যেন আমার নিতান্ত আপনজন হয়ে উঠেছে। এখন আর তাকে ডাকতে হয় না। মনে হয় সব সময় গোপাল যেন আমার সঙ্গেই রয়েছে। এ-কথা কাউকে বলবার নয় দাদা, বলিও না কাউকে। কথা উঠল, তাই আপনাকে এই প্রথম বললাম। অন্যের থেকে আমি আলাদা যদি হয়ে থাকি তো হয়েছি এইখানে।

নবীন বললে, আমি যদি বলি—এ তোমার কল্পনার বিলাস ?

কথা বলতে বলতে মনে হলো মালা যেন আর সে-মালা নয়।

তার সারা মুখখানি কেমন যেন একটি কমনীয় দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। মুদিত কমলের মত চোখ ছুটি বন্ধ করে মালা তার সুচারু সুন্দর ওষ্ঠপ্রান্তে একটুখানি হাসি টেনে এনে বললে, কল্পনার বিলাস? বলুন। তাতে আমার কিছুই এসে যায় না।

মালার এই পরিচয় নবীন কাল পায়নি। তার এ-রূপ সে দেখেনি। হঠাৎ মনে হলো, ঝিলিমিলি-মদনপুরের কাছারি-বাড়ীতে যাবার আগে গোপালের মন্দিরে আহত সেই পাখীটি ছুহাত দিয়ে তুলে নিয়ে যখন সে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল, তখন একবার যেন মালার এই রূপ সে দেখেছিল।

নবীন কি যেন বলতে যাচ্ছিল, মালা চট করে চোখ চেয়ে সহজ হয়ে গিয়ে বললে, ও-সব কথা থাক্। আপনি কি আজ রাত্রেই বাড়ী ফিরে যাবেন?

—তাই তো ভেবেছিলাম। কিন্তু তোমার বাবাও এখনও এলেন না—

বলেই সে তার হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললে, ট্রেণটাও বোধ হয় এতক্ষণ চলে গেছে। মালা বললে, বেশ তো। থাকুন এইখানে। কাল যাবেন। আমরা খুব খুশী হব।

—তোমার বাবা হয়ত খুশী হবেন। কিন্তু তুমি?

—আমি?

বলেই মালা চট করে চোখ বুজে একবার নিজেকে যেন দেখে নিলে। তার পরেই বললে, যদি বলি—বাবার চেয়েও বেশি খুশী হব আমি। বিশ্বাস করবেন?

নবীন বললে, কি জানি মালা, আমার সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি—আমার ভয় হচ্ছে, এই বাড়ীতে আমি রাত্রিবাস করবো, কাল সকালে দেখব—সারা গ্রামে টি-টি পড়ে গেছে। তোমার নামের সঙ্গে আমার নামটা জড়িয়ে—

মালা বললে, জড়াক না। আমি ভয় পাই না। কোনও মিথ্যাকেই আমি আর ভয় পাই না।

নবীন বললে, মিথ্যা অপবাদকে ভয় কর না, কিন্তু নিজেকে? নিজেকে বিশ্বাস কর?

মালা এইবার খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো।

সে কী হাসি!

হাসির বেগ একটু কমে এলে তেমনি হাসি-হাসি মুখেই বললে, আমার গোপাল সে ব্যবস্থা করে রেখেছে। দেখবেন?

বলেই মালা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

তারপর তেমনি হাসতে হাসতে যাকে সে এ-ঘরে ধরে নিয়ে এলো, তার মুখের দিকে তাকিয়ে নবীন একেবারে বিস্মিত হতবাক হয়ে অভিভূতের মত চুপ করে বসে রইলো। মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না।

যাকে দেখবার জন্যে মনে-মনে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, এমন অকস্মাৎ তার সঙ্গে যে এমনি করে দেখা হয়ে যাবে—নবীন তা' ভাবতেও পারেনি।

নবীন শুধু একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলে, সুধা! তুমি?

মালা বললে, অনেক আগেই আমার বলা উচিত ছিল। পাশের ঘরে লুকিয়ে রেখেছিলাম একটু মজা করবো বলে।

মজা কিন্তু মন্দ হলো না। নবীনের বুক ভরে উঠলো আনন্দে।

মালা বললে, দাঁড়াও, আলোটা জ্বালি। নইলে এক্ষুনি অন্ধকার হয়ে যাবে। তোমরা কথা বল।

এই বলে সে দূরে গিয়ে লণ্ঠন জ্বালতে বসলো।

নবীন আর সুধা—দু'জন দু'জনের মুখের পানে তাকিয়ে। সুধা মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছে। হাসিটা কেমন যেন বিষণ্ণ ম্লান।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, এমনটি কেমন করে হলো সুধা?

কথাটা মালা শুনতে পেয়েছে। লণ্ঠনটি এনে তাদের কাছে নামিয়ে দিয়ে বললে, আমার গোপালের ইচ্ছায়।

—তোমাদের চেনাশোনা ছিল তা তো জানতাম না। নবীন বললে, কই সুধা, তুমি তো আমাকে বলনি?

সুধা বললে, আমি কিই-বা তোমাকে বলেছি আর কতটুকুই-বা বলেছি!

নবীনকে সুধার এই 'তুমি' সম্বোধন শুনে মালা একটুখানি বিস্মিত হলো।

বিস্মিত হলো, কিন্তু বিচলিত হলো না। সুধাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে মালা হাসতে হাসতে বললে, সুধা আমার পথের বন্ধু—ঘাটের বন্ধু।

বলেই তার গালটা টিপে দিয়ে বললে, চট্ করে উনোনে আগুনটা দিয়েই আমি একবার মন্দির থেকে ফিরে আসি। তোমরা ততক্ষণ গল্প কর।

এই বলে সে নবীনের দিকে তাকিয়ে তাকেও এক ঝলক্ হাসি উপহার দিয়ে একরকম ছুটেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

নবীন বললে, একজন গাঁয়ের বৌ, একজন গাঁয়ের মেয়ে, কেমন করে পরিচয় হলো তোমাদের?

—পুকুরের ঘাটে। জল আনতে গিয়ে। রাসে, ঝুলনে, জন্মাষ্টমীতে গোপালের মন্দিরে।

বলতে বলতে সুধা বসলো একটা মোড়া টেনে নিয়ে। বললে, কী অদ্ভুত মেয়ে এই মালা! সামান্য একটুখানি লেখাপড়া শিখেছে, কিন্তু যে-কোনও বিষয় নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বল, ও ঠিক জবাব দিয়ে যাবে। গান যে ও কোথায় শিখেছে কে জানে, অথচ ওর গান যদি শোনো তো মুগ্ধ হয়ে যাবে। দুবেলা রান্না করে, হাট থেকে দোকান থেকে জিনিস নিয়ে আসে, কলসী কাঁখে নিয়ে পুকুরে জল

আনতে যায়, সাঁতার কাটে, গাছে চড়ে, আবার গোপালের মন্দিরে গিয়ে যখন দাঁড়ায়, মনে হয় যেন ভক্তিমতী মীরা।

নবীন বললে, ওর কথা থাক্। পরে শুনবো। আজ তুমি এখানে কেমন করে এলে তাই বল।

সুধা বললে, খুব রাগ করেছিলে তো! কি ভাবলে? মেয়েটা জন্মের মত চলে গেল—একটিবার দেখা দিয়ে গেল না?

নবীন বললে, না। অত ছোট ভাবনা ভাবিনি। ভেবেছিলাম, সূর্যটা হঠাৎ নিভে গেল, পৃথিবীটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। তুমি আসবার আগে পর্যন্ত মাঝে মাঝে সেই রকমই যেন মনে হচ্ছিল।

সুধা বললে, ষ্টেশন পর্যন্ত আমার সঙ্গে আসতে চেয়েছিল তোমার গোমস্তামশাই, আমি আসতে দিইনি। চুপিচুপি এইখানে এসে মালাকে ধরে বসলাম। মালা তার বাবাকে পাঠিয়ে দিলে তোমার কাছে।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, এখন তুমি কি করবে ঠিক করলে? কোথায় যাবে?

সুধা বললে, এই দুটো চোখ যেদিকে নিয়ে যাবে।

—এত সাহস কিন্তু ভাল নয়। বিপদ হতে পারে।

—যে-বিপদের কথা তুমি ভাবছো, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, সে বিপদ হবে না।

—নিশ্চিন্ত হতে পারছি না যে!

—তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি ভেবো না।

—নিজের ওপর তোমার এত বিশ্বাস?

—এখনও পর্যন্ত সে-বিশ্বাস হারাইনি।

—যদি কোনওদিন হারাও?

—আমার ভালবাসা আমাকে রক্ষা করবে।

—সে ভালবাসা তো হাওয়ায় ভেসে বেড়াবে। সে তো শুধু কল্পনা।

—ভগবানের প্রতি ভালবাসাও তো মানুষের কল্পনা।

—জীবনটাকে তুমি কি এমনি করেই নষ্ট করে দেবে?

—নষ্ট হবে না তুমি বিশ্বাস কর।

—বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি তোমাকে যেতে দেব না।

এই বলে নবীন হাত বাড়িয়ে সুধার একখানা হাত চেপে ধরলে। বললে, তুমি আমার।

সুধা বললে, কে বলছে আমি তোমার নয়?

—তবু তুমি বলছো তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে?

সুধা বললে, হ্যাঁ, যাব। যাবার প্রয়োজন আছে।

—পারবে ছেড়ে যেতে?

বড় করুণ হাসি হেসে সুধা বললে, আমি আমার ছেলেকে ছেড়ে এসেছি—ভুলে যাচ্ছ কেন?

কথাটা নবীনকে ভাবিয়ে তুললে। নবীন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতে বাধ্য হলো। কি যেন ভেবে সে আবার বললে, কিন্তু সুধা, আমার মনে হচ্ছে—তোমার আমার দুটো জীবনই তুমি নষ্ট করে দিলে।

সুধা তার নিজের দুটি হাত দিয়ে নবীনের হাতখানি চেপে ধরে বললে, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না লক্ষ্মীটি, আমি আমার জীবনকে আরও সুন্দর করে গড়ে তুলবো তুমি দেখো। আর তোমাকে আমি অত নীচে নামতে দেব না বলেই আমি আজ তোমার কাছ থেকে সরে যেতে চাই।

নবীন বললে, কিন্তু তুমি যে-ক্ষুধা আমার মধ্যে জাগিয়ে দিলে সে-ক্ষুধার তৃপ্তি কোথায়?

সুধা বললে, তুমি যদি সত্যিই আমাকে ভালবাসো, দেখবে সে-ক্ষুধার তৃপ্তি আছে তোমার মনে।

নবীন তার হাতখানা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললে, না না না—দেহ ছাড়া মন আমি কল্পনা করতে পারি না সুধা।

সুধাও উঠে দাঁড়ালো। বললে, ছি ছি, এই উচ্ছিষ্ট দেহ? এ দেহ দুদিনেই পুরনো হয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে, বিস্বাদ হয়ে যাবে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে মনও যাবে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে। তখন কী সান্ত্বনা থাকবে আমাদের, বলতে পারো? এসো, তুমি অত উতলা হয়ো না। আমি তাহ'লে কিছুতেই তোমাকে ছেড়ে যেতে পারব না।

এই বলে নবীনের হাতে ধরে সুধা আবার তাকে তার জায়গায় এনে বসিয়ে দিলে।

নবীন বললে, তুমি যেখানেই যাও, আমাকে চিঠি লিখে জানাবে বল?

—নিশ্চয় জানাব।

—টাকাপয়সার দরকার হলে আমার কাছে নিঃসঙ্কোচে চাইবে?

—চাইব।

—বিপদে পড়লে আমাকে ডাকবে?

—তাও কি তোমাকে বলে দিতে হবে? পাগল!

সুধা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে বললে, তোমার আর কি কি প্রতিজ্ঞা করাবার আছে করিয়ে নাও।

নবীন মুখ তুলে তাকালে সুধার দিকে। তার হাতে হাত রেখে বললে, যদি কোনোদিন আমি দুর্বল হয়ে পড়ি, যদি কোনদিন কোথাও কোনও সান্ত্বনা খুঁজে না পাই, আমি তোমাকে ডাকবো। তুমি আসবে বল?

সুধা বললে, আসব—আসব—আসব। যেখানেই থাকি, ছুটে চলে আসব তোমার কাছে। যেখানে তুমি আসতে বলবে—সেইখানে।

নবীন বললে, এ-সব কথা আমি কেন বলছি জানো সুধা? কিছুতেই আমি ভুলতে পারছি না—আমি মানুষ।

সুধা পরম যত্নে নবীনের মাথার চুলগুলি ঠিক করে দিয়ে বললে, ভুলতে হবে কেন? শুধু মনে রেখো—এই মানুষই হয় দেবতা। তবে এমনিই হয় না, সে-দেবত্ব তাকে তার সাধনা দিয়ে অর্জন করে নিতে হয়। দেবতা বলে আলাদা কোনও জাত নেই।

—কিন্তু দেবতা যদি আমি না হতে পারি সুধা? আমার ভালবাসা, আমার প্রেম---সে কি মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে?

কথা বলতে গিয়ে সুধার দুটি চোখ জলে ভরে এলো। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলতে লাগলো, তোমার প্রেমের দাবী কি শুধু আমার এই দেহ? ক্ষুধিত পশুর মত আমার এই দেহটাকে পাঁকের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে তাকে কামড়ে ছিঁড়ে হত্যা না করে ফেলতে পারলে কি তোমার প্রেম শান্তি পাবে না?

নবীন বললে, বিচারবুদ্ধিহীন ক্ষুধিত একটা পশুর সঙ্গেই তোমার পরিচয় হয়েছে সুধা, পরিপূর্ণ মানুষের সঙ্গে হয়নি। তাই তুমি এই নিষ্ঠুর আত্মনিগ্রহের পথটাকেই বেছে নিয়েছ। এমনি করেই ভাবছো তুমি তোমার প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখবে। তার গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগতে দেবে না। আমি সব বুঝতে পারছি সুধা। আমি তোমার পথ চেয়ে বসে থাকবো। তোমার ভুল যেদিন তুমি বুঝতে পারবে—আজ আমার কাছে তুমি শুধু এইটুকু বলে যাও যে সেদিন তুমি আসবে আমার কাছে?

সুধা বললে, বলেছি তো—ছুটে আসবো। পূজার নৈবেদ্যর মত এই দেহ আমি তোমারই হাতে তুলে দেবো।

বাইরে ডাক শোনা গেল—সুধা!

মালা ফিরে এসেছে মন্দির থেকে। পরণে লাল চওড়া পাড় পাটের সেই শাড়ীখানি—যাবার সময় বোধকরি পরে গিয়েছিল। গায়ে জামা নেই। এলো চুল ঘাড়ের ওপর একটা গিঁট দিয়ে বাঁধা। একহাতে দুধের ঘটি, আর একহাতে নৈবেদ্যর প্রসাদ।

সুধা তার পিছু পিছু মালার ঘরে গিয়ে উঠলো।

—এ কী রকম মেয়ে রে তুই ? এই ভর্ সন্ধ্যেবেলা এমনি খালি গায়ে মন্দিরে গিয়েছিলি ?

—কেন কি হয়েছে ? রোজই তো যাই।

হাতের জিনিসগুলো নামিয়ে মালা কাপড় ছাড়ছিল।

কাপড় ছাড়লে, জামা গায়ে দিলে, সুধা দেখলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তারপর হাসতে হাসতে বললে, নাঃ, মেয়েদের এত রূপ ভাল নয়।

মালা বললে, কার কথা বলছিস ? আমার না তোর ?

—আমার যা হবার তা তো হয়েই গেছে, আমি তোর কথা বলছি।

কথাটাকে মালা গ্রাহ্যই করলে না। বললে, ভদ্রলোককে সেই বিকেল থেকে চুপচাপ বসিয়ে রেখেছি। এক কাপ চা পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। তোকে বলে গেলেই পারতাম। আর তাই-বা কেমন করে হতো ? বাড়ীতে দুধ ছিল না। গরীবের কি কম জ্বালা !

দু'জনেই তারা রান্নাঘরে এলো। সুধা জিজ্ঞাসা করলে, তোর বাবা কোথায় ?

—বাবাকে পাঠালাম জেলে-পাড়ায়। কিছু মাছ যদি পায়—

সুধা বললে, ওঁর নাম করে কাছারিতে পাঠালি না কেন ?

মালা বললে, কাছারিটা তুই ভুলতে পারছিস না, না ? তার দরকার হবে না। বাবা দেখলাম একঝুড়ি আনাজপত্তর নিয়ে মন্দিরে বসেছিল ; আরতি শেষ করে বাবা বললে, তুই চট করে দুধটা নিয়ে গিয়ে চা করে দিগে যা। আমি গেলে রান্না চড়াবি। —হ্যাঁরে, এতক্ষণ কি হচ্ছিল তোদের ? চুপচাপ বসে ছিলি ? আমার সম্বন্ধে কিছু বলছিলেন ?

—কেন? তোর সম্বন্ধে কিছু বলতে যাবে কেন? তোকে ওর খুব ভাল লেগেছে বুঝি?

মালা হাত জোড় করে বললে, রক্ষে কর্ বাবা ভাল-লাগালাগি। দাদার বিয়ে হবে, একটা বউ আসবে বাড়ীতে। আমি বিয়েই করব না।

—গোপাল-মন্দিরের সেবাদাসী হয়ে সারাজীবনটা কাটাতে পারবি?

—নিশ্চয়ই পারব।

চায়ের জল গরম হয়ে গেছে। কেট্‌লিটা উনোন থেকে নামিয়ে চায়ের ওপর ঢালতে ঢালতে মালা বললে, তুই নিজে কি করবি তাই ঠিক কর আগে। আমার কথা কাউকে ভাবতে হবে না। সত্যি বল্ না কি করবি?

সুধা বললে, আগে নিজেদের বাড়ীতে যাব। বাবার জন্যে খানিকটা কাঁদবো। আমার এক দিদি আছে—তরুদিদি। তার কাছে থাকবো দিনকতক। কলকাতায় আমার এক বন্ধুকে চিঠি লিখবো—তার জবাব না আসা পর্যন্ত থাকবো। তারপর চলে যাব কলকাতায়। একটা কাজকর্ম ঠিক জুটিয়ে নেবো দেখবি।

—তোর সঙ্গে আর আমার কোনোদিন দেখা হবে না?

—দেখতে যদি চাস্, চিঠি লিখবি। আসবো। তোর বিয়ের খবরটা দিতে ভুলিস না যেন।

মালা বললে, বলছি আমি বিয়ে করবো না, তবু বলে—বিয়ে, বিয়ে—

—তুই বললে কি হবে মালা, বাপ্ বেঁচে রয়েছে, যেমন করে হোক, যেখান থেকে হোক্, একটা বাঁদরকে ধরে এনে দেবে জুটিয়ে। তখন কি করবি? পারবি রুখে দাঁড়াতে? সেই বিপদের দিনে—

কথাটা তাকে শেষ করতে দিলে না মালা। মনে হলো যেন

সে শিউরে উঠলো। চোখ বুজে বললে, গোপাল আমাকে রক্ষা করবে।

খুব আনন্দেই কাটলো রাতটা।

দু'জন পাকা রাঁধুনী অনেকক্ষণ ধরে রান্না করলে তাদের এই সম্মানিত অতিথিটির জন্যে।

নবীনের খাওয়া যখন চুকলো, রাত তখন এগারোটা। রান্নার পাট চুকিয়ে নিজেরা খেয়েদেয়ে সুধা আর মালা এ-ঘরে যখন এলো তখন পল্লীগ্রামের নিশুতি রাত্রি থম্-থম্ করছে।

বাড়ীটা গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে।

শেয়ালগুলো মনে হচ্ছিল যেন বাড়ীর উঠোনে এসে ডাকতে আরম্ভ করেছে।

ফর্সা চাদর আর বালিস দিয়ে বিছানা পেতে দিয়েছিল নবীনের জন্যে। নতুন জায়গার জন্যই হোক্ কিংবা অন্য যে কোনও কারণেই হোক্ তখনও সে ঘুমোতে পারেনি। বুকের কাছে একটা বালিস টেনে নিয়ে সিগ্রেট টানছিল।

মালা আর সুধা দুজনে এলো হাসতে হাসতে।

সুধা বললে, আজ তোমাকে খুব কষ্ট দিলাম আমরা।

—কি রকম কষ্ট শুনি?

—খেতে রাত্রি হলো। রান্না কেমন হলো কিছু বললে না তখন, তারপর এই তো—এখনও দেখছি তুমি ঘুমোতে পারনি।

নবীন বললে, যার বাড়ী, কই সে তো কিছু বলছে না!

সুধা এইবার মালাকে ঠেলে দিলে।—'নে, এইবার তুই বল্।'

'তোর মত আমি বলতে জানি না যে!'

বলতে বলতে খাটের একপাশে বসে পড়লো মালা।

—বসে পড়লি যে? এইখানেই থাকবি নাকি?

মালা উঠে দাঁড়ালো। বললে, যাঃ!

বলেই একটু হেসে তার গায়ে একটা ঠেলা মেরে বললে, খেয়ে আর আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না।

—তা বেশ তো, শুয়ে পড় না এইখানে। আমি চলি।

রহস্যটা আরও মর্মান্তিক হয়ে উঠল।

পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে পালাচ্ছিল মালা। সুধা তাকে ধরে ফেললে। বললে, শোন্। কাল চলে যাব। আর হয়ত জীবনে কারও সঙ্গে কোনোদিন দেখা হবে না। তাই বড় সাধ হচ্ছে—আজকের এই রাতটিকে স্মৃতির খাতায় অমর করে রাখি। নে বোস্, তোর একটি গান শোনা।

এই বলে মালাকে জোর করে বসিয়ে দিয়ে সুধা নিজেও বসলো তার পাশে।

মালা গান গাইবে—শোনবার জন্য নবীন ভাল করে উঠে বসলো।—হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। গান শুনি। তোমাকেও গাইতে হবে সুধা।

সুধা বললে, মালার গানের পর আমার গান জমবে না।

—তাহ'লে তুমি আগে গাও।

সুধা বললে, আমি যে আবার হারমোনিয়াম ছাড়া গাইতে পারি না।

মালা বললে, ভাঙ্গা একটা ছোট হারমোনিয়াম আছে আমাদের বাড়ীতে। আনবো ?

সুধা বললে, নিয়ে আয়।

মালা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল হারমোনিয়াম আনতে। যাবার সময় লণ্ঠনটা হাতে করে নিয়ে চলে গেল।

ঘর অন্ধকার। বাইরে ঝিঁ-ঝিঁ ডাকা নিস্তব্ধ রাত্রি ঝিম্-ঝিম্ করছে। ঘরের ভেতর বসে আছে নবীন আর সুধা।

নবীন হাত বাড়িয়ে সুধার হাতখানা চেপে ধরলে। চুপিচুপি ডাকলে, সুধা!

সুধাও নবীনের হাতের ওপর তার একখানি হাত রেখে বললে, উঁ—

—তুমি চলে যাবে?

—যাব।

পাশের বারান্দার ও-পাশে ভৈরব যে-ঘরে শুয়ে আছে, সেই ঘরে আছে হারমোনিয়াম। বারান্দাটা পেরিয়েই মালার কি যেন মনে হলো, সে আবার ফিরে এলো। এ-ঘরে এসেই বললে, ছি ছি, মনের ভুলে আলোটা নিয়ে চলে গিয়েছিলাম।

বলেই সে লণ্ঠনটা নামিয়ে রেখে বললে, আমাদের ঘরে আর-একটা লণ্ঠন শুধু শুধু জ্বলছে। নিয়ে আয় না ভাই।

সুধা উঠে গিয়ে লণ্ঠনটা এনে বললে, চল আমিও যাই। লণ্ঠন আর হারমোনিয়াম একা আনতে পারবি না।

দুজনেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বারান্দায় গিয়ে মালা চুপিচুপি বললে, অন্ধকারে বসেছিলি দুজনে, তোর ভয় করছিল না?

সুধা তখন অন্য কথা ভাবছিল। বললে, ভয়? কিসের?

মালা যেতে যেতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললে, বাঘের।

সুধাও হাসলে। ম্লান একটুখানি হাসি। হেসে শুধু বললে, না।

মালা বললে, প্রথমে ভেবেছিলাম—সবাই যেমন হয় এও বুঝি তেমনি। তারপর যতই দেখছি ততই ভাল লাগছে।

সুধা সে কথার কোনও জবাব দিলে না। মনে হলো তখনও কি যেন সে ভাবছে।

দুজনেই ফিরে এলো। একজনের হাতে লণ্ঠন। একজনের হাতে হারমোনিয়াম।

প্রথমে গান গাইল সুধা। সুধা নিজেই বলেছে—মালার গানের পর তার গান জমবে না।

হ্যাঁ, গান সে গাইবে। আজ তার মন চাইছে গান গাইতে। প্রাণ খুলে গান সে এখানে এসে অবধি গায়নি। মালার সঙ্গে পরিচয় হবার পর নির্জন সন্ধ্যায় হয়ত বাঁধা পুকুরের ঘাটে, নয়ত গোপাল-মন্দিরের চত্বরে বসে কালেভদ্রে চাপাগলায় গুন-গুন করে গেয়েছে এক-আধটা গান। সে তো গান নয়, সে তার কান্না! সারা অন্তর কেঁদে উঠেছে অসহ্য যন্ত্রণায়, বেদনা-জর্জরিত মন তার মুক্তি চেয়েছে সুরের সুরলোকে। তাই গানের ভাষায় প্রার্থনার মত ধ্বনিত হয়ে উঠেছে তার অন্তরের অকথিত বাণী!

হারমোনিয়ামটা ভাল নয়, গলাটাও হয়ত গেছে খারাপ হয়ে, তবু সে গাইলে।

গাইলে রবীন্দ্রনাথের গান, গাইলে অতুলপ্রসাদের গান।

ব্যথার পূজা নিবেদন করলে তার জীবন-দেবতার কাছে।

দুঃসহ বেদনার ভার যেন হাল্‌কা হয়ে গেল।

এইবার মালার পালা।

তার গানে দুঃখ নেই, বেদনা নেই, শুধু আনন্দ। বিরহ নেই, কান্না নেই, শুধু মিলন!

কে রচনা করেছে সে-সব গান, কে সুর দিয়েছে কিছুই সে জানে না। দূর-দূরান্তের কত বাউল-বৈষ্ণব আসে গোপাল-মন্দিরে গান গাইতে। আসে, গান গায়, প্রসাদ পায়—চলে যায়। কেউ তাদের দিকে ফিরেও [illegible] না। এ-অঞ্চলে এমনি সাধারণ তারা।

সেই সব সাধারণের [illegible] অসাধারণও থাকে।

মালা ঠিক তাকে [illegible] পারে। গানগুলি তুলে নেয় তার কাছ থেকে।

এমনি করেই মালা সংগ্রহ করেছে তার গান।

সেই গানে মালা দিয়েছে প্রাণ।

কণ্ঠে ঢেলেছে দরদ, আর সুরে দিয়েছে এক অভিনব বৈচিত্র্য।

গান তারা সারারাত ধরে চালাতে পারতো, কিন্তু মালা বললে, থাক্, আর গাইব না। আমাকে ভোরে উঠতে হবে।

॥ ৫ ॥

আশ্চর্য মেয়ে দুটোর কাণ্ড-কারখানা। অত রাত পর্যন্ত জেগে রইলো, আবার ঠিক ঝুঁঝ্‌কি রাত থাকতে কখন যে বিছানা ছেড়ে উঠেছে, কখন্‌ যে পুকুরে গিয়ে স্নান করে এসেছে, কখন্‌ যে গোপাল-মন্দিরের কাজ সেরে এসে উনোন ধরিয়ে চা করেছে—নবীন কিছুই জানতে পারেনি।

জানতে পারলে তখন—মালা যখন হাসতে হাসতে চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

খিড়কির পুকুরে মুখ-হাত ধুয়ে এসে নবীন বোধকরি চায়ের জন্যই অপেক্ষা করছিল, চায়ের কাপটি হাতে নিয়ে বললে, আর-একজন কি করছে?

মালা বললে, তাকে আজ আমি রান্নাঘরে ঠেলে দিয়েছি।

—কিন্তু আজই তো সে চলে যাবে।

—যেতে দিচ্ছে কে?

—আমি যদি যেতে চাই, আমাকেও কি আটকাবে নাকি?

মালা বললে, সে ক্ষমতা কি আমার আছে?

নবীন বললে, যদি বলি—আছে?

—তাহ'লে একবার চেষ্টা করে দেখবো।

—কিন্তু তাতে তোমার লাভ?

—লাভ লোকসান বুঝি না। তবে এইটুকু শুধু বলতে পারি—আপনাকে খুব খারাপ লাগছে না।

এই বলে সে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কিন্তু আবার তক্ষুনি সে ফিরে এলো।

—ফিরে এলে যে?

—একটা কথা বলতে এলাম।

—কী কথা বল।

—বন্দুক দিয়ে পাখী যদি মারেন তো ভাল লাগবে না কিন্তু।

—পাখী না মেরে যদি অন্য কাজ করি?

—কি কাজ করবেন? ও তো শুধু মারতেই জানে।

কি যে জবাব দেবে বুঝতে পারছিল না নবীন। কথাটা বলে বসেছিল কথা বলবার ঝোঁকে।

সুমুখে আমগাছটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে ফেললে, ধরো, বন্দুক দিয়ে যদি ওই গাছ থেকে আম পাড়ি?

—পারেন পাড়তে?

—নিশ্চয়ই পারি।

—কই পাড়ুন দেখি।

এই বলে চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে মালা এবার সত্যিই চলে গেল।

বন্দুকটা হাতে নিয়ে নবীনও বেরুলো তার পিছু পিছু।

আমগাছের তলায় গিয়ে নবীন সত্যি সত্যিই একটি আমের বোঁটা লক্ষ্য করে আওয়াজ করল। টুপ্ করে একটি আম পড়ে গেল গাছের নীচে।

মালা তার হাতের কাপ-ডিসটা নামিয়ে রেখে ছুটে গিয়ে আমটি কুড়িয়ে আনলে। বললে, আমার দাদা থাকলে দেখতেন সেও ঠিক পেড়ে দিতে পারতো।

নবীন বললে, মেয়েদের দাদারা সব পারে।

এই বলে বন্দুকটি সে মালার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললে, দাদার বোন পারে কি না দেখি।

হাসতে হাসতে মালা বন্দুকটা একবার হাতে নিলে।

—ওরে বাবা, এ যে বেশ ভারি!

সুধাকে ডাকতে লাগলো, সুধা, বন্দুক চালাবি?

রান্নাঘরের জানলার পেছনে এসে দাঁড়ালো সুধা। বললে, তুই চালা। আমি দেখি।

বন্দুকটা নামিয়ে মালা তক্ষুনি তার শাড়ীটাকে আঁট-সাট করে পরে নিয়ে বললে, বলুন এবার কেমন করে কি করতে হয়।

বন্দুক কেমন করে ধরতে হয়, কেমন করে চালাতে হয় দেখাতে গিয়ে দু'জনে যখন বেশ একটুখানি মাখামাখি হয়ে উঠেছে, পেছনে ডাক শুনে নবীন আর মালা দু'জনেই তাকিয়ে দেখে, তাদের ম্যানেজার বিনোদবাবু আসছেন, আর তাঁর পিছু পিছু আসছে সতীশ গোমস্তা।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কখন এলেন?

—এক্ষুনি এলাম।

বিনোদবাবু বললেন, কাছারিতে গিয়ে শুনলাম, সতীশ বললে, তুমি কাল থেকে এইখানে রয়েছ, তাই এইখানেই এলাম একটা কথা বলতে।

—কি কথা বলুন। আসুন, ভেতরে বসবেন আসুন।

—না, আমি আর বসবো না। কথাটা বলেই কাছারিতে চলে যাব। আমার কাজ আছে। মা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, মা আমার চিঠি পায়নি?

বিনোদবাবু বললেন, পেয়েছেন। সেই চিঠি পেয়েই তিনি বললেন, আপনি এক্ষুনি যান গাড়ীটা নিয়ে। নবীনকে বলুন সে যেন আজই বাড়ী ফিরে আসে।

—কেন বলুন তো?

—তা আমি কেমন করে জানবো।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, আপনি গাড়ী নিয়ে এসেছেন?

—ওই তো গাড়ী! রাস্তায় রেখে এসেছি।

নবীন বললে, ড্রাইভারকে খাইয়ে আপনি গাড়ীটা এইখানে

পাঠিয়ে দিন। এবেলা আমাকে না খাইয়ে ভৈরব কিছুতেই [illegible]
না।

বিনোদবাবু সতীশকে সঙ্গে নিয়ে কাছারিতে চ[illegible]

তারা চলে যাবার পর সুধা বেরিয়ে এলো। [illegible]
বললে, ভাগ্যিস আমাকে এখানে দেখতে পায়নি।

নবীন বললে, কিন্তু যা দেখেছে সেটাও বড় কম নয়।

—কি দেখেছে? সুধা জিজ্ঞাসা করলে।

নবীন বললে, মালাকে আমি বন্দুক ছোঁড়া শেখাচ্ছিল[illegible]

সুধা হাসতে হাসতে বললে, সেটা তো আমিও দে[illegible]

মালা বললে, তার জন্যে তুই কি আমাকে শাস্তি দি[illegible]

—দিতেও পারি।

—কই দে না।

সুধা বললে, কি শাস্তি দেব ভেবে দেখি।

ভেবে দেখতে সুধার হয়ত দেরি হতে পারে, কিন্তু নবীনের ম্যানেজার বিনোদবাবুর বিন্দুমাত্র দেরি হ'লো না।

কাছারিতে ফিরে গিয়েই তিনি সতীশকে বললেন, ড্রাইভারটাকে তাড়াতাড়ি চারটি খাইয়ে গাড়ীটা বিদেয় করে দাও। নবীনকে নিয়ে চলে যাক্।

তাড়াতাড়ি যাওয়ার ব্যাপার সতীশের গৃহিনীর হাতে।

খবরটা তাকে দেবার জন্য যেই সে পা বাড়িয়েছে, দেখলে, গৃহিনী থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে।

সতীশ বললে, শুনলে তো? ড্রাইভারকে খাইয়ে দাও।

গোমস্তা-গিন্নি বললে, দিচ্ছি। কি দেখলে সেখানে? তোমার বাবু কি করছে?

সতীশ বললে, তুমি যা বলেছ ঠিক তাই। জমে গেছে মালার

সঙ্গে। অত বড় সোমত্ত মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে বন্দুক ছুঁড়তে শেখাচ্ছে।

গিন্নি বললে, আমি জানি যে। তুমি কোনও কম্মের নও। যত-সব বুড়ো-হাবড়া ঘাটের মড়া ধরে ধরে এনে নিজের মেয়েদের কপালে তেঁতুল গুলে দিলে, আর ওই কালাহাতীর কপাল ছাখো। মেয়েটাকে জুটিয়ে দিলে অতবড় একটা জমিদারের ছেলের সঙ্গে।

কথাগুলো সে বিনোদবাবুকে শুনিয়ে শুনিয়েই বললে। বিনোদবাবুর সঙ্গে এমনি আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলা তার চিরকালের অভ্যাস।

বিনোদবাবু বললেন, তা আর আমি হতে দিচ্ছি না। শোনো সতীশ, আজ সন্ধ্যেবেলা তুমি একবার ভবতারণকে ডেকে আনো। আমি তার ছেলের সঙ্গে ভৈরবের মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি।

সতীশের স্ত্রী বেশ ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো, তা দেবেন বই-কি! কই, আমার একটা মেয়েকেও তো পার করে দেননি! আপনার যত দয়া ওই লোকটার ওপরেই।

—না না, দয়া নয়, দয়া নয়। এতে আমার স্বার্থ আছে।

বিনোদবাবু পেছন ফিরে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, সে-সব তুমি বুঝবে না।

—ওই বলেই তো থামিয়ে দিয়েছেন আমাকে চিরকাল। কেন, বুঝব না কেন? ওর ছেলেকে আপনি কলকাতায় পড়ার খরচ দিচ্ছেন না?

বিনোদবাবু বললেন, আরে দূর দূর! ওটা কি আর দেওয়া নাকি? ধরো, তোমার ছেলে যদি পড়তো, তাকেও দিতাম। ওটা হচ্ছে গিয়ে এদের জমিদারী-সেরেস্তায় বিদ্যাদান খাতে কিছু খরচ করতে হয়, তাই আমি মাসে মাসে কিছু কিছু করে দিতাম। তাও তো এখন আর দিতে হয় না। শুনছি নাকি

ছেলেটা একটা টিউশনি যোগাড় করেছে। আমার মেয়ে চাঁপাকে জানো তো ?

সতীশের স্ত্রী বললে, শুনেছি।

বিনোদবাবু তাকে বুঝিয়ে বললেন যে,—তাঁর সেই মেয়ে চাঁপা যে-কলেজে পড়ে, ভৈরবের ছেলে মণিও সেই কলেজে পড়ে।—তাই আর ওকে আলাদা করে টাকা পাঠাতে হয় না। চাঁপাকে টাকা পাঠিয়ে লিখে দিই—এই থেকে মণিকে গোটা-দশেক টাকা দিস্।

সতীশ-গৃহিনী কিন্তু সহজে ভুলবার মেয়ে নয়। বললে, মেয়ের বিয়ের খরচটা তো মাসে মাসে দিলে চলবে না। ওটাও তাহলে জমিদারী-সেরেস্তার কন্যাদান খাতে লিখে দিন।

বিনোদবাবু এবার হো-হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, সেইটেই দেখতে পাবে। ভবতারণ যখন আসবে সন্ধ্যেবেলা, তখন নিজের কানে শুনো।

—তাই শুনবো। বলে সতীশের স্ত্রী হাতের ইসারায় সতীশকে কাছে ডেকে বললে, এসো। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

সুড়্-সুড়্ করে সতীশ উঠে গেল তার পিছু পিছু।

ঘরে ঢুকেই গিন্নি বললে, আমার কথা তো কখনও রাখো না। এবার একটা কথা রাখবে ?

সর্বনাশ! মেয়েটা বলে কী!

সতীশ বললে, জীবনে যা কিছু করেছি, তোমার কথা শুনেই তো করেছি। কি কথা রাখতে হবে বল।

গিন্নি বললে, কালাহাতীর মেয়ের বিয়েটা যাতে ভেঙ্গে যায় তাই তোমাকে করতে হবে।

সতীশের কাছে কথাটা মোটেই বড় কথা নয়। তবু বললে, তারপর আমাদের নবীনবাবু যদি বলে বসে বিয়ে করবে ?

গিন্নি বললে, ক্ষেপেছ ? তোমার বাবুটি অত বোকা নয়।

পূজোরী বামুনের মেয়ের সঙ্গে আর সবকিছু করতে পারে, কিন্তু বিয়ে করবে না।

সতীশ বললে, ঠিক আছে। তুমি শুধু দেখে যাও আমি কি করি।

ভৈরব আচার্য্য শুনলে, নবীনকে নিয়ে যাবার জন্যে গাড়ী পাঠিয়েছেন তার মা। ম্যানেজার বিনোদবাবু এসেছেন গাড়ী নিয়ে।

ভৈরব বললে, ছাখো তোমার সঙ্গে কেমন ড্যাং-ড্যাং করে চলে যেতে পারতাম হাওয়াগাড়ীতে চেপে। মেয়েটার বিয়ের জন্যে তোমার মায়ের কাছে কিছু চাইতাম গিয়ে। কিন্তু যাবার জো আছে আমার? একদিকে গোপালের পূজো, একদিকে পিওনের চাকরি।

সুধা আজ খুব ভাল করে কাছে বসে বসে খাওয়ালে নবীনকে। মালা বললে, কী আছে আমাদের বাড়ীতে অমন করে খাওয়াচ্ছিস?

সুধা বললে, এ-বাড়ীতে যা আছে তা আর কোথাও নেই।

মালা খিল্-খিল্ করে হেসে উঠলো। বললে, সত্যি?

সুধা সেকথার জবাব দিলে না। ঘাড় ফিরিয়ে একটিবার তার দিকে তাকালে শুধু।

বিনোদবাবু ঠিক সময়েই গাড়ীটা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ভৈরব গিয়েছিল গোপাল-মন্দিরে। যাবার আগে নবীনকে বলে গিয়েছিল—তোমার মাকে গিয়ে বোলো—গোপালের পূজো তোমার ঠিকই চলছে মা, আমি যতদিন বাঁচবো ততদিন ঠিকই চলবে।

এই বলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে কি যেন একটা কথা বলতে গিয়েও বলতে পারেনি। শুধু বলেছিল, আচ্ছা নবীন, রাস, ঝুলন,

জন্মাষ্টমী—গোপালের এমনি একটা পার্বণের সময় গাড়ী করে মাকে একটিবার এখানে আনতে পারো না?

নবীন বলেছিল, মাকে বলবো গিয়ে।

ভৈরব বলেছিল, হ্যাঁ বাবা, বোলো।

এই বলে সে তার ফুলের সাজিটি হাতে নিয়ে চলে গিয়েছিল।

গাড়ীতে গিয়ে ওঠবার সময় মালা একটি প্রণাম করলে নবীনকে। সুধা একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলো। কাছে এলো না।

হঠাৎ কি ভেবে যেন নবীনই ফিরে এলো তার কাছে। বললে, আমার গাড়ী তো যাবে সুতোহাটির পাশ দিয়ে। আমি তোমাকে সুতোহাটিতে নামিয়ে দিয়ে যেতে পারি। যাবে আমার সঙ্গে?

সুধা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, বুঝেছি।

বলেই সে মালাকে কাছে ডাকলে। বললে, আমি যদি ওর সঙ্গে চলে যাই, তোর কি খুব কষ্ট হবে?

মালা ম্লান একটু হাসলে। হেসে বললে, তুই কি চিরকাল আমার কাছে থাকবি নাকি? আজ না যাস, কাল চলে যাবি। হেঁটে হেঁটে গিয়ে ট্রেন ধরবি কেন? যা—গাড়ীতে চড়েই চলে যা।

সুধা ইতস্ততঃ করছিল। মালা বললে, ভাবছিস কি? গাড়ীর কাছে লোক জড়ো হয়ে যাবে এক্ষুনি। তখন আর উঠতে পারবি না।

এই বলে সে তার ব্যাগটা নিজেই হাতে করে নিয়ে গিয়ে গাড়ীতে তুলে দিলে। বললে, যেখানেই থাকিস, মনে করে ঠিকানাটা জানাস।

—জানাবো। বলে সুধা চুপিচুপি গাড়ীতে গিয়ে উঠলো।

সুতোহাটি ষ্টেশনের কাছাকাছি গাড়ীটা যেতেই সুধা বললে, এইখানে রাখো গাড়ীটা।

গাড়ী থামলো। সুধা আঙুল বাড়িয়ে টালির একখানা বাড়ী দেখিয়ে দিয়ে বললে, ওই বাড়ী।

—তা এখানে দাঁড়ালে কেন? চল, আমি বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসি। তিন বছর পরে আসছো, হাল-চাল কি হয়েছে না হয়েছে কিছুই তো জানো না।

—কিন্তু···

—না, কোনও কিন্তু শুনবো না। চল।

এই বলে সুধার হাতখানা সে চেপে ধরলে। একশ টাকার একখানি নোট সুধার হাতে গুঁজে দিয়ে বললে, কেউ কাছে থাকলে এটা দিতে পারবো না। রাখো এইটে সঙ্গে। কাজে লাগবে।

বলবার অনেক কথাই ছিল, কিন্তু ড্রাইভার রয়েছে গাড়ীতে, কোন কথাই সুধা বললে না। নোটখানি মাথায় ঠেকিয়ে আঁচলের খুঁটে বাঁধলে প্রথমে, তারপর হাত বাড়িয়ে নবীনের দুটি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে একটি।

তারপর সুটকেসটি হাতে নিয়ে নবীনের চোখে চোখ রেখে কি কথা যে সে বললে তা' তারাই বুঝলো, তারপর বাঁ-হাত দিয়ে গাড়ীর দরজা খুলে নেমে গেল সুধা। বললে, এখান থেকে যাবার আগে তোমাকে জানাবো। তুমি চলে যাও।

॥ ৬ ॥

নবীন সোজা তার নিজের ঘরে গিয়ে বন্দুক রেখে, ব্যাগ রেখে, জামা-কাপড় ছেড়ে হাত-পা ধোবার জন্যে স্নানের ঘরে যাচ্ছিল, বারান্দার ওপর মার সঙ্গে দেখা।

—চা খাবি ?

—হ্যাঁ, খাব। আসছি।

স্নানের ঘর থেকে ফিরে এসে নবীন দেখলে, মা বসে আছেন তার ঘরে। তোয়ালে দিয়ে মাথাটা মুছতে মুছতে বললে, বিনোদবাবু বললেন, এক্ষুনি যাও। কি দরকার বল তো।

বিন্দুবাসিনী বললেন, বলছি, বলছি। এত তাড়া কিসের ? ঠাণ্ডা হয়ে বোস্। চা-টা খা।

নবীন বললে, না, তুমি এক্ষুনি বল মা।

—দাঁড়া, আসছি।

মা বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। খানিক পরেই ফিরে এলেন—ছিপ্‌ছিপে গড়নের ফর্সা একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে।

—এটি আবার কে ?

মা বললেন, আমাদের ম্যানেজারবাবুর মেয়ে—চাঁপা। কেমন মেয়েটি বল্ দেখি ?

নবীন বললে, বুঝেছি। এই জন্যেই বিনোদবাবুর এত তাড়া।

নবীন একবার ভাল করে দেখে নিলে মেয়েটিকে।

বিন্দুবাসিনী তার হাতে ধরে নিজের পাশে বসিয়ে বললে, বল্ এবার কেমন মেয়ে।

নবীন বললে, আমাকে বলতে হবে ?

—হ্যাঁ। তোকেই তো বলতে হবে।

নবীন বললে, ভাল।

—পছন্দ হয়?

—পছন্দ? কেন? একে বিয়ে করতে হবে নাকি?

মা বললেন, সেই জন্যেই তো আনিয়েছি।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, কি যেন নাম বললে?

—চাঁপা।

নবীন হাসতে হাসতে বললে, চাঁপা তো গাছে ফুটে থাকে। চাঁপা তো ফুল। চাঁপাকে বিয়ে করে নাকি কেউ?

—ও-সব হেঁয়ালী রাখ্ বাবা। তুই নিজে বললি মেয়ে দেখে পছন্দ করে বিয়ে করবি, তাই একে আনালাম কলকাতা থেকে।

নবীন বললে, সতীশ গোমস্তার সংসারে বিয়ের ব্যাপার যা দেখলাম মা, বিয়ে করবার ইচ্ছে আমার যদি-বা ছিল, সেই সব দেখে-শুনে ইচ্ছেটা আমার চলে গেল। একটা-আধটা নয় মা, যতগুলো দেখলাম—সব। যেন মনে হলো জন্তু-জানোয়ার। সতীশের ছেলেটা, সতীশের জামাইটা—

মা বললেন, ওদের সঙ্গে তুই নিজের তুলনা করছিস কেন?

—ওই রকম বিয়ে তো আমারও হবে।

—তা কেন হবে? বিন্দুবাসিনী বললেন, এই তো মেয়ে এনে দিয়েছি, ছাখ্ ভাল করে, পছন্দ যদি হয় তো বিয়ে কর্।

নবীন বললে, আমার একার পছন্দ হলে তো হবে না মা। ওরও পছন্দ হওয়া চাই। আর শুধু বাইরের চেহারা দেখে পছন্দ করা উচিত নয় মা। কত সুন্দর চেহারার আড়ালে কত কুৎসিত মন লুকিয়ে থাকে। মনের পরিচয় হলো আসল পরিচয়।

মা এবার বোধহয় রাগ করলেন। বললেন, জানি না বাবা, আমরা সেকালের মানুষ, অত-সব জানি না।

—জানো না বলেই তো দেশের এই দুরবস্থা। মানুষের পেটে জন্মাচ্ছে যত জানোয়ার, আর ভূত-প্রেত।

মা বললেন, আমাকে রাগাস্ না নবীন। যে-দেশের দিকে তাকিয়ে তোরা এই সব কথা বলিস, সে দেশে তো দেখছি, বৌগুলোকে নিয়ে মানুষগুলো জ্বলেপুড়ে মরছে। আজ বিয়ে করছে, কাল ছাড়ছে। ছেলের মা মেয়ের মা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে নিজে বিয়ে করবে বলে। বেশির ভাগ লোকের ঘর নেই, সংসার নেই, মনে সুখ নেই, শান্তি নেই।

নবীন বললে, কিন্তু মা, ভুল যারা করে, বিপদে পড়ে তারাই। তারাই চেঁচায়, ছটফট্ করে,—তাদেরই আমরা দেখতে পাই। কিন্তু ভুল করেনি—সেরকম লোকের সংখ্যাও বড় কম নয়। তাদেরই ছেলেমেয়েরা বিদ্যায় বুদ্ধিতে বিজ্ঞানের নিত্য নতুন অভূতপূর্ব আবিষ্কারে সারা পৃথিবীটাকে বারবার চমকে দিচ্ছে। তারা আর যাই হোক—বাপ-মায়ের ভালবাসার সন্তান—সেকথা আমি হলফ করে বলতে পারি।

মা বললেন, তা বেশ বাবা, এই নে, আমি এনে দিয়েছি এই মেয়েটিকে। কলকাতায় বি-এ পড়ছে, নেহাত অশিক্ষিতা মেয়ে নয়। কথাবার্তা কয়ে ছাখ্, ভাল যদি লাগে তো বিয়ে কর। আর নইলে বল্ আমি কাশী-টাসি কোথাও চলে যাই বাবা, এরকম করে আর একা-একা আমার ভাল লাগছে না।

এই বলে মা উঠে দাঁড়ালেন। চাঁপাকে ঘরের ভেতর রেখে তিনি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। কিন্তু চৌকাঠের বাইরে পা দিয়েই তিনি পেছন ফিরে তাকাতেই দেখেন চাঁপা তাঁর পিছু-পিছু উঠে এসেছে।

—এ কি? তুমি চলে এলে যে?

চাঁপা বললে, কি করব?

মা বললেন, যাও না, কথাবার্তা কও নবীনের সঙ্গে। তুমি তো গ্রামের মেয়েদের মতন লাজুক ঘরকুণো মেয়ে নও।

মাথা হেঁট করে চাঁপা বললে, না মা, লজ্জা করে। উনি কি মনে করবেন!

এমন সময় এক ডিস খাবার আর চা নিয়ে হরিয়া এসে দাঁড়ালো দোরের কাছে। মা তার হাত থেকে ট্রে'টা নিয়ে চাঁপার হাতে ধরিয়ে দিলেন। বললেন, যাও, এইটে নিয়ে নবীনকে দিয়ে এসো।

চাঁপাকে চা আনতে দেখে নবীন বললে, আপনি চা আনলেন কেন? হরিয়া কোথায়?

চাঁপা সেকথার জবাব দিলে না। ট্রে থেকে খাবার প্লেটটি তুলে নিয়ে নবীনের হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে বললে, আপনি আমাকে 'আপনি' বলবেন না।

নবীন বললে, বেশ, বলব না।

—চা তৈরি করব?

—কর।

বলেই একটা মিষ্টি মুখে দিয়ে নবীন বললে, মা তোমাকে কেন এখানে আনিয়েছেন জানো তো?

চাঁপা কাপের ওপর 'লিকার' ঢালছিল। চোখ তুলে একবার তাকিয়ে মুচকি একটু সলজ্জ হাসি হেসে বললে, শুনলাম।

নবীন বললে, শুধু শুনলাম বললে চলবে না। তুমি ছেলেমানুষ নও। তোমারও একটা মত আছে। নির্ভয়ে সে মত তোমাকে প্রকাশ করতে হবে।

—আমার মত যদি জানতে চান তো আমি বলছি—বিয়ে আমি করব না।

নবীন বললে, ভাল, ভাল। আমার কথাগুলো শুনে আমাকে খুশী করবার জন্যে বলছো তা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু—

—না না, আপনাকে খুশী করবার জন্যে বলিনি। সত্যি বলছি -আমি এখন বিয়ে করব না।

নবীন কিন্তু ধরে বসলো সেই এক কথা।—আমাকে খুশী করবার জন্যে নিশ্চয় বলেছ। ওটা মেয়েদের স্বভাব।

চাঁপা বললে, মেয়েদের আপনি চেনেন না। মেয়েরা বুঝি সব পুরুষকেই খুশী করতে চায়?

নবীন হো-হো করে হেসে উঠলো। চায়ের কাপটা চাঁপার হাত থেকে নিজের হাতে নিয়ে বললে, চায় চায়—আমি জানি।

চাঁপা বললে, বিয়েই যখন আমি করব না, তখন আপনাকে আমি খুশী করতে চাইব কেন?

—কথাটা বিশ্বাস করতে পারলাম না। এটা তোমার মনের কথা নয়?

—আপনি যে বিয়ে করবেন না বলছেন, সেটাও তাহ'লে আপনার মনের কথা নয়।

নবীন বললে, আমি বিয়ে করব না বলিনি। বিয়ে আমি করব, কিন্তু আমার মনের মত মেয়ে চাই। এই ধরো, তুমি যদি আমার মনের মত হও তো তোমাকেও আমি বিয়ে করতে পারি।

চাঁপা বললে, মনটা বুঝি একা আপনার?

নবীন বললে, দু'জনার কথাই বলছি। দু'জনেরই ভাল লাগা চাই।

চাঁপা বললে, দেখুন, আপনি অবশ্য আমার চেয়ে অনেক বেশি বোঝেন, তবু একটা কথা আমি বলতে চাই, শুনবেন?

—নিশ্চয়ই শুনবো। বল। কান আছে, ঠিক শুনতে পাব।

—না, কান দিয়ে নয়। মন দিয়ে শুনতে হবে। তা যদি শোনেন তো বলি।

—আচ্ছা বল, মন দিয়ে শুনবো।

চাঁপা বললে, দেখুন, আমার যতটুকু জ্ঞানবুদ্ধি, তাতে মনে হয়—চোখের দেখাটাকে একেবারে বাতিল করে দিলে চলে না। প্রথম

দেখবামাত্র যাকে ভাল লাগে, শেষ পর্যন্ত তারই সঙ্গে মনের মিল হয়।

নবীন বললে, ইংরেজি একটা কথা আছে—'লাভ এট্ ফার্স্ট সাইট্।' সেই কথাটা পড়ে বলছো না তো?

চাঁপা বললে, আজ্ঞে না।

—আচ্ছা, খুব একটা অপ্রীতিকর কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি। যা সত্যি তাই জবাব দাও। আমাকেও তো তুমি আজ প্রথম দেখলে। তোমার চোখ কি বললে বল।

চাঁপা বললে, বলবো না। আপনারও তো চোখ আছে। আপনিও তো প্রথম দেখলেন।

এই বলে মেয়েটা ছুটে পালিয়ে গেল ঘর থেকে।

বিন্দুবাসিনী ঘরে ঢুকতেই নবীন বললে, ম্যানেজারবাবুর মেয়েটি বেশ মা।

মা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। বললেন, যাক্ বাবা, বাঁচলাম। তোর যে মেয়ে পছন্দ হয়েছে—এই ঢের।

নবীন বললে, থামো মা, থামো, এত আশা কোরো না। মেয়েটাকে আমি এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। কেমন যেন হেঁয়ালী হেঁয়ালী মনে হচ্ছে।

—কেন, কি বলছে কি?

—বলছে, বিয়ে করবে না।

বিন্দুবাসিনী বললেন, আজকালকার ছেলেমেয়েদের এ কী হয়েছে বলতে পারিস? সবাই বলছে, বিয়ে করবে না। দার্জিলিংএ দীপ্তিকে টেলিগ্রাম করেছিলাম ইলার জন্যে। ইলা ইস্কুলের মাষ্টারনী হয়েছে। বিয়ে করবে না। তুই বলছিস বিয়ে করবি না। আবার চাঁপাও বলছে বিয়ে করবে না।

নবীন বললে, কেন বলছে জানো মা? বিয়ের ব্যাপারটা দেখে

দেখে সবাই বুঝতে পেরেছে—এইখানে গোলমাল হলেই বাস্, জীবনটি খতম্।

মা বললেন, তাই বলে ম্যানেজারের ওই মেয়েটার যদি বিয়ে হয় তোর সঙ্গে, তাহলেও কি ও বলতে চায়—ওর জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে?

—কি জানি মা, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

চাঁপা বিয়ে করবে না বলায় নবীন অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে। মেয়েটা যদি এমন জেদ ধরে বসে থাকে তো ভালই হয়।

চাঁপা বলছিল—Love at first sight.

কথাটা বোধকরি সে মিথ্যা বলেনি।

বি-এ পড়া মেয়ে চাঁপা—গায়ের রং ফর্সা, শরীরের গড়ন ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত তেমনি। মুখখানি সুন্দর। তবু তাকে তার ভাল লাগলো না কেন?

চাঁপারও বোধকরি তাকে ভাল লাগেনি।

বিন্দুবাসিনী কিন্তু মরীয়া হয়ে উঠলেন। বললেন, আসুক ওর বাবা! তার পর দেখাচ্ছি ও কেমন করে বিয়ে করবো না বলে! বলি হ্যাঁরে চাঁপা, কোথায় তুই?

এই বলে তিনি চাঁপার কাছে গিয়ে বললেন, ছাখ চাঁপা, তোর বাবা আমার বাড়ীতে চাকরি করে—তুই আমার কর্মচারীর মেয়ে। আমার ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে হওয়া মানে তোর ভাগ্যির কথা। আর সেইখানে তুই বলছিস কিনা—বিয়ে করবো না!

চাঁপা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো হেঁটমুখে।

বিনোদবাবু ছট্‌ফট্ করছিলেন ভৈরবের জন্য। সতীশ নিজে গিয়ে তাকে ডেকে আনলে কাছারি-বাড়ীতে।

ভৈরব ভেবেছিল ম্যানেজারবাবু নিজে যখন ডেকে পাঠিয়েছেন,

তখন এবার তার ব্যবস্থা একটা-কিছু হবেই। সতীশ তাকে খুব ফাঁকি দিচ্ছে।

ভৈরব বললে, আজ তিন বছর হলো—দেবোত্তর জমির ধান-চাল—আমার যা পাবার কথা, সতীশ তার অর্ধেকও দিচ্ছে না আমাকে। এই তো সতীশ, বল না—তুমি নিজেই বল না!

সতীশ বললে, থামো। সেজন্যে তোমাকে ডাকা হয়নি।

ভৈরব বললে, কি বললে? তিন বছর নয়? ছাখো—মিছে কথা বোলো না সতীশ, ম্যানেজারবাবু রয়েছেন চোখের সামনে।

এতক্ষণ পরে ম্যানেজারবাবু কথা বললেন।—এটা তোমারও খুব অন্যায় সতীশ, ও-বেচারারই বা চলে কেমন করে?

সতীশ বললে, তুটো তো মাত্র মানুষ। ছেলেটা তো থাকে কলকাতায়। ওর আবার খরচ কিসের?

ম্যানেজারবাবু সতীশকে ধমক দিলেন। বললেন, তাই বলে তুমি ওর পাওনা ওকে দেবে না? গত তিন বছরের ওর সমস্ত পাওনা ওকে চুকিয়ে দিতে হবে।

ভৈরব যাতে না শুনতে পায় সেইরকম ভাবে সতীশ বললে, মরে যাব তাহ'লে।

ম্যানেজারবাবু বললেন, মর। তোমার মরাই উচিত।

এই বলে তিনি সতীশকে ছেড়ে দিয়ে ভৈরবের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলের খবর কি?

ভৈরব শুনেছে কথাটা। বললে, আপনার আশীর্বাদে ভালই আছে। চিঠি লিখেছে। আপনার মেয়ের নাম বুঝি চাঁপা? লিখেছে—চাঁপা একবার আপনার কাছে আসবে। ওরা এক কলেজেই পড়ে।

ম্যানেজারবাবু বললেন, চাঁপা এসেছে।

ভৈরব ঠিক বুঝতে পারলে না কথাটা। বললে, আজ্ঞে না,

মণি আসবার কথা কিছু লেখেনি। লিখেছে, বি-এ পাশ করে সে আইন পড়বে। আমি বলি—আইন পড় আর যাই পড় বাবা, আমার অবস্থা তো জানো। তুমি এই যে বি-এ পড়ছো—সেও এই ম্যানেজারবাবুর দয়ায়! আজ আমার ছেলে যে বি-এ পড়বে—সে কি আমি কোনোদিন ভাবতে পেরেছিলাম বাবু? গোপালের কাছে তাই আমি দিনরাত আপনাদের মঙ্গল কামনা করি!

ম্যানেজারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়ের বিয়ের কি ব্যবস্থা করলে?

ভৈরব বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, মেয়ে ভাল আছে।

—ভাল আছে তা জানি। আজ সকালেই তা দেখে এসেছি নিজের চোখে।

এই বলে ভৈরবকে শুনিয়ে শুনিয়ে ম্যানেজারবাবু বেশ জোরে জোরে বললেন, তার বিয়ের কি ব্যবস্থা করলে?

ভৈরব বললে, আমি তার কি ব্যবস্থা করবো বলুন। আমার কি সে ক্ষমতা আছে? গোপালকে বলছি দিনরাত—উনি যদি দয়া করে আমাকে এ দায় থেকে উদ্ধার করেন, তবেই। নইলে আমার কোনও ভরসা নেই।

হঠাৎ তাদের পেছনে নারীকণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল।

সতীশ দেখলে তার স্ত্রী এসে দাঁড়িয়েছে।

—ভরসা নেই কেন? আমাদের বাবুকে নিয়ে গিয়ে রাখলি কোন্ ভরসায়?

ম্যানেজারবাবু মুখ ফেরালেন না। সেইখান থেকেই বললেন, সতীশ, তোমার স্ত্রীকে থামতে বল।

সতীশ উঠে গেল তার স্ত্রীর কাছে। বললে, তুমি এখানে এসে দাঁড়ালে কেন? ছাখো-না আমরা কি করি।

—তোমরা তো সবই করবে!

সতীশের স্ত্রী বললে, দাও না আমাকে ছেড়ে। তুর্কি নাচন্ নাচিয়ে দিচ্ছি ওই কালাহাতীকে!

সতীশ তার স্ত্রীকে চেনে। কাজেই অস্বীকার করতে পারে না সেকথা। বললে, হ্যাঁ, তা তুমি পারো। আমরা যদি কিছু করতে না পারি, তোমাকে ডাকব।

সতীশের স্ত্রী চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলে, ম্যানেজারবাবু ওর মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবেন—কথাটা সত্যি?

কথাটা এমন চুপিচুপি বললে যে ম্যানেজারবাবু তার প্রতিটি কথা স্পষ্ট শুনতে পেলেন। তিনি বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, হ্যাঁ, সত্যি। তোমার কি? তুমি যাও না এখান থেকে!

এর পর আর সেখানে তার দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। সতীশের স্ত্রী চলে অবশ্য গেল, কিন্তু যাবার সময় বলে যেতে ছাড়লে না— 'কই, আমার মেয়ের বিয়ে তো কেউ দিয়ে দেয়নি!'

ম্যানেজারবাবু চীৎকার করে উঠলেন, সতীশ!

—এই যে স্যার, যাই। ওর মুখে কিছু আট্‌কায় না—জানেন তো!

বলতে বলতে সতীশ এলো ম্যানেজারবাবুর কাছে।

এসেই দেখলে সেখানে পশুপতি এসে দাঁড়িয়েছে। ম্যানেজারবাবু বোধহয় সেইজন্যই চীৎকার করেছেন ভেবে পশুপতির দিকে কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে সতীশ বললে, তুমি আবার এখানে এসে দাঁড়ালে কেন? যাও, তুমি নিজের জায়গায় যাও।

পশুপতি ম্যানেজারবাবুর পায়ের কাছে বসে পড়লো।

—দেখুন স্যার, আপনি দেখুন। উনি আমার শ্বশুর। আমি ওঁর কন্যাকে বিবাহ করেছি। আর আমার সঙ্গে ব্যবহারটা দেখুন। ওঁরা দুই স্বামী-স্ত্রী আমাকে কি বলে ডাকে জানেন? ডাকে—বুড়ো বলে।

সতীশ আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠলো, আঃ!

—আ কেন ? উনি জানেন সবই, বুঝেন সবই। তবু একবার দেখুন নিজের চোখে। আমার বসবার জায়গা কোথায় জানেন ? ওই যে ওই গাছের তলায়—ওই যেখানে তিনটে ছাগল বাঁধা রয়েছে। ওই ছাগলের সঙ্গে আমিও ছাগল হয়ে আছি।

ম্যানেজারবাবু বললেন, তুমি রয়েছ কেন এখানে ? বাড়ী চলে যাও না।

পশুপতি বললে, সমস্যাটা তো আপনাকে বললাম আজ সকালে। আপনি বলে দিন আপনার গোমস্তাকে। ওঁর কন্যাটিকে ছেড়ে দিক্। বাস্, আমি নিয়ে চলে যাচ্ছি।

ম্যানেজারবাবু পশুপতির ব্যাপারটা বেশ ভাল করেই জানেন। এ আজ নতুন নয়। বিয়ের পর থেকে মেয়েটাকে চার-চারবার সতীশ নিয়ে আসে পশুপতির বাড়ী থেকে। পশুপতি আসে, ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকে, ঝগড়াঝাঁটি করে, তারপর নিয়ে যায় তার এই তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীটিকে। একই কাজ বারম্বার করার গোপন রহস্য ম্যানেজারবাবু জানতেন না। সতীশ যা বলতো, তিনি শুধু সেই কথাটাই জানতেন—জামাই মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে কষ্ট দেয়। পশুপতি আজ দিয়েছে হাটে হাঁড়ি ভেঙে। দিয়েছে সব ফাঁস করে।

সতীশ অস্বীকার করতে পারেনি। বলেছে—তা জামাই বড়লোক। গরীব শ্বশুরকে যদি দু'দশ টাকা দিয়ে সাহায্য করে, তাতে ক্ষতিটা কী ?

পশুপতি বলেছে, দু'দশ টাকা হলে গ্রাহ্য করতাম না। দু' শ' টাকা বলুন। গতবারে দু'শ' টাকা, তার আগের বারে একশ' পঁচিশ টাকা। এবার কিন্তু আমি পঞ্চাশ টাকার বেশি দেবো না।

মেয়ে পাঠাবে না পাঠাবে না বলে সেই টাকার অঙ্কটাকে সতীশের বাড়িয়ে নেবার মতলব। ম্যানেজারবাবু বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি তা' বুঝতে পেরেছেন। বুঝতে পেরেছেন—টাকা না নিয়ে

সতীশ মেয়ে পাঠাবে না। বৌ না নিয়ে এ-লোকটাও নড়বে না।

অথচ এই পশুপতির সামনে তাঁর গোপন কথা কিছু বলবারও উপায় নেই। তাই তিনিই চেষ্টা করলেন এর একটা মীমাংসা করে দেবার। সতীশকে বললেন, তাই নাও না বাবা এবারকার মতন, যা দিচ্ছে তাই নিয়ে—দাও ওদের বিদেয় করে।

—পঞ্চাশটা টাকা মেয়ের জামা-কাপড় কিনতেই ফুরিয়ে যাবে।

—জামা-কাপড় কিনতে হবে কেন? সে-সব জামাই কিনবে।

পশুপতি বললে, সেকথা আর কোন্ লজ্জায় বলবেন? এই সেদিন কিনে দিয়েছি তিরিশ টাকার। সে সব ওঁর গুষ্টিবর্গের কাজে লেগেছে।

সতীশ কি আর বলবে! বললে, জামাইএর কথা শুনুন! 'গুষ্টিবর্গ'—

পশুপতি ম্যানেজারের পায়ের কাছে আর একটু সরে গিয়ে বসলো। বললে, আপনি যদি বলেন তো আরও পঁচিশটা টাকা বাড়াতে পারি।

কথাটা সতীশকে বোধকরি শুনিয়েই বলা হয়েছিল। সতীশ বললে, না। পুরোপুরিই করে দিতে বলুন।

ম্যানেজারবাবু তাকালেন পশুপতির দিকে।

পশুপতি চোখ টিপে তার সম্মতি জানালে।

নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন ম্যানেজারবাবু। এই ঝুট-ঝামেলায় তাঁর নিজের কাজ কিছু হচ্ছে না। বললেন, বেশ, তাহ'লে এই কথা রইলো সতীশ, একশ'টি টাকা নিয়ে মেয়ে-জামাইকে কাল বিদেয় করে দাও।

সতীশ ভাঙবে, তবু মচ্‌কাবে না। বললে, তাই হবে। আপনি যখন বলছেন—||

ম্যানেজারবাবু বললেন, হ্যাঁ, বলছি। এসো দেখি তোমা একটা কথা বলি। ভৈরব অনেকক্ষণ থেকে বসে আছে চুপ করে। পশুপতি, ভৈরবকে একটু তামাক-টামাক খাওয়াও।

এই বলে সতীশকে তিনি আড়ালে একটা ঘরের ভেতর নিয়ে গেলেন। বললেন, বোসো। অনেক কথা আছে।

শতরঞ্জি-বিছানো তক্তোপোষের ওপর সতীশকে বসিয়ে দিয়ে নিজেও তার একপাশে বসলেন। ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে একাসনে এমনভাবে পাশাপাশি বসবার সৌভাগ্য সতীশের কোনোদিন হয়নি, তাই সে প্রথমে একটুখানি সঙ্কোচ বোধ করছিল, কিন্তু ম্যানেজারবাবু তার গায়ে হাত রেখে নিজেই তার সে সঙ্কোচ ভেঙে দিলেন। বললেন, ছাখো সতীশ, ভৈরবকে আজ এখানে কেন ডেকেছি তা বোধহয় তুমি জানো। আমি এখানে এসেছিলাম নবীনকে নিয়ে যাবার জন্যে। কেন জানো? নবীনের সঙ্গে আমি আমার মেয়ে চাঁপার বিয়ে দেবো।

সতীশ বললে, খুব ভাল কথা।

—কিন্তু এ-কথা এখনও কেউ জানে না। তুমিই জানলে। কাউকে বোলো না।

সতীশ তার জিব বের করে দুটো কানে হাত দিয়ে বললে, রামঃচন্দ্র! কেউ জানবে না।

ম্যানেজারবাবু বললেন, কিন্তু আজ নবীনকে ডাকতে গিয়ে ভৈরবের বাড়ীতে যে-দৃশ্য নিজের চোখে দেখলাম, তার পর থেকে আমার রীতিমত ভয় হয়ে গেছে—নবীন না বলে বসে, ভৈরবের মেয়েটাকেই বিয়ে করবে।

সতীশ বললে, আজ্ঞে না। গিন্নিমা কি এত অবুঝ হবেন? পূজোরী বামুনের মেয়েটাকে বাড়ীতে নিয়ে যাবেন বৌ করে?

—কিছু বিশ্বাস নেই সতীশ, দিনকাল যা পড়েছে তার সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই, তাই এ-কথা বলছো। এখন আর

ছেলে-মেয়েদের স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দেওয়া চলবে না। তাছাড়া ভৈরবের মেয়েটা আমার মেয়ের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী।

ম্যানেজারবাবুর মন রাখবার জন্যেই বোধকরি সতীশ বলে উঠলো, সুন্দরীর কথা আর বলবেন না স্যার। আমার বড়-বৌ-এর চেয়ে সুন্দরী মেয়ে এ-তল্লাটে কেউ আছে বলে তো মনে হয় না। কিন্তু কই, আমার ছেলে ফকির তো তাকে দিব্যি ছেড়ে দিলে।

—তোমার ছেলের কথা ছেড়ে দাও। আমি যা বলছি মন দিয়ে শোনো।

—বলুন।

ম্যানেজারবাবু বললেন, ভবতারণের কাছে গিয়েছিলে ?

সতীশ বললে, ডেকে এসেছি। আসবে এক্ষুনি।

ম্যানেজারবাবু বললেন, ভবতারণের ছেলের সঙ্গে ভৈরবের মেয়ের বিয়েটা দিয়ে দিই। বাস্, জ্বালা-জঞ্জাল চুকে যাক্। আমি তা'হলে নিশ্চিন্ত হয়ে নবীনের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়েটা এই মাসের শেষ-নাগাদ দিয়ে দিতে পারি।

ভবতারণ এখনও জানে না তাকে কি জন্যে ডাকা হয়েছে। সতীশ তাকে আসতে বলেছে শুধু। ম্যানেজারবাবু ডেকেছেন। কাছারি-বাড়ীতে তাকে আসতেই হবে। কিন্তু নিজে উদ্যোগী হয়ে কালা-ভৈরবকে তার কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করে দেবেন ম্যানেজারবাবু—এইটেই সতীশকে কেমন যেন পীড়িত করে তুললে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এলো যেন তার বক্ষস্থল বিদীর্ণ করে। বললে, ভবতারণ আসুক, এলে বলুন তাকে। আপনার কথা সে কাটতে পারবে না।

—এখনও তো এলো না সে। আর কতক্ষণ ভৈরবকে বসিয়ে রাখবো ?

সতীশ বললে, তাহ'লে যাই আর-একবার।

ম্যানেজারবাবু বললেন, হ্যাঁ, যাও।

যেতে কিন্তু হ'লো না শেষ পর্যন্ত।

সতীশ দোর খুলে বেরুতে যাচ্ছে, ভবতারণের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। কাঁচা পাকা মাথার চুল, বাঁধানো দাঁত, চোখে চশমা, হাতে লাঠি—ভবতারণ ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় ম্যানেজারবাবু?

ম্যানেজারবাবু এগিয়ে এলেন।—'এসো ভবতারণ, এসো।'

ভবতারণকে চেয়ার দেওয়া হলো বসতে। ভবতারণের অবস্থা ভাল। তবু আজ তার খাতিরটা যেন একটু বেশি-বেশিই মনে হচ্ছে।

ম্যানেজারবাবু বললেন, ছেলেটি তোমার চাকরি করছে তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, লোহার কারখানায় চাকরি, খাটতে হয় বেশি, মাইনে কম।

—কত পায়?

—একশ' টাকা।

—তা ঘরের খেয়ে একশ' টাকা মন্দ কি?

ভবতারণ হাসলে একটুখানি।

ম্যানেজারবাবু আর দেরি করলেন না। তাড়াতাড়ি কথাটা পেড়ে বসলেন, ছেলের এইবার বিয়ে দাও।

ভবতারণ বললে, দেবো তো ভাবছি, কিন্তু আর একদিকে যে বিপদে পড়ে গেছি।

—সে আবার কি? বিপদ কিসের?

ভবতারণ বললে, বিয়ের যুগ্যি আমার একটি মেয়ে রয়েছে যে বাড়ীতে। মেয়ের বিয়ে না দিয়ে ছেলের বিয়ে যে দিতে পারছি না।

ম্যানেজারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়ের পাত্র ঠিক করেছ ?

ভবতারণ বললে, দেখছি তো অনেক জায়গায়, কিন্তু টাকা বড় বেশি চাচ্ছে সবাই।

সতীশ বললে, তা চাইবে।

ম্যানেজারবাবু সতীশের দিকে কট্‌মট্‌ করে তাকালেন।

তাদের কথার মাঝখানে কী দরকার তার কথা বলবার? বললেন, সতীশ, তুমি এক কাজ কর। ভৈরব তোমার জামাই-এর সঙ্গে কথা বলছে, ওকে ওখান থেকে তুলে এনে অন্য জায়গায় নিয়ে বসাও। তামাক-টামাক দাও। বেচারা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে আছে।

সতীশ চলে যেতেই ভবতারণ তার চেয়ারটাকে একটু টেনে নিয়ে গেল ম্যনেজারবাবুর কাছে। তারপর মুখ বাড়িয়ে চুপি-চুপি বললে, আপনি যদি একটু দয়া করেন তো এক্ষুনি আমার মেয়ের বিয়েটা হয়ে যায়।

ম্যানেজারবাবু বললেন, আমি যদি দয়া করি? তার মানে ?

—মানে, আপনাদের ওই কালা-ভৈরবের একটি ছেলে আছে। ছেলেটিকে আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন। দেখতে-শুনতে ভাল। বি-এ পড়ছে। আপনি যদি একটু জোর করে বলেন তো আপনার কথা ভৈরব কাটতে পারবে না।

ম্যানেজারবাবু বললেন, কিন্তু ওরও যে সেই এক সমস্যা। ওরও মেয়ের তো বিয়ে দিতে হবে।

ভবতারণ বললে, দিক আমার ছেলের সঙ্গে।

—তুমি রাজী ?

—খুব রাজী। ওর ছেলে মেয়ে দুটোই দেখতে-শুনতে ভাল।

ম্যানেজারবাবু এইটিই চাইছিলেন মনে-মনে। কিন্তু মুখে আগ্রহ প্রকাশ না করে বললেন, ভেবে ছাখো ভবতারণ, ভৈরবের কিছু নেই। মেয়ের বিয়েতে একটি পয়সাও সে খরচ করতে পারবে না।

ভবতারণও বোকা নয়। বললে, আমিও খরচ করতে পারব না। কেউ কিছু নেবে না—বাস্, তাহ'লেই হলো।

ম্যানেজারবাবু বললেন, না, হলো না। ওর ছেলে খুব কষ্ট করে বি-এ পড়ছে। বলছে, বি-এ পাশ করে 'ল' পড়বে। কিন্তু যদি বলে বসে—পয়সাকড়ি কিছু চাই না, শুধু আমার পড়ার খরচ দিতে হবে শ্বশুরকে।

ভবতারণ কি যেন ভাবলে। ভেবে বললে, বোনের বিয়েটা তো বিনা পয়সায় হয়ে যাচ্ছে।

ম্যানেজারবাবু বললেন, তোমার নিজের জামাই হবে, জামাইকে যদি আইন পড়িয়ে নিতে পার তোমার মেয়েই সুখে থাকবে। তোমার পয়সাকড়ি আছে, তুমি আর আপত্তি কোরো না।

ভবতারণ বললে, আপনি বলছেন এই কথা?

—হ্যাঁ, বলছি।

ভবতারণ রাজী হয়ে গেল। বললে, ঠিক আছে। দিন আপনি ঠিক করে।

ঠিক করতে হলে কি করতে হবে ম্যানেজারবাবু তা' জানেন। সেদিন রাত্রেই সতীশকে পাঠালেন কলকাতায়। চিঠি লিখে দিলেন ভৈরবের ছেলে মণিকে—'এই চিঠি পাবামাত্র তুমি এখানে চলে এসো। বিশেষ প্রয়োজন।'

চিঠি পেয়েই মণি জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় যেতে হবে? আমাদের কাছারিতে?

—হ্যাঁ। ওইখানেই তিনি রয়েছেন।

—এ রকম ভাবে হঠাৎ তিনি কেন ডাকলেন বলতে পারেন?

বলতে সতীশ পারেতো, কিন্তু বললে না। বলতে বারণ করে দিয়েছিলেন ম্যানেজারবাবু। সতীশ বললে, তা জানি না।

মণি সেইদিনই সতীশের সঙ্গে চলে এলো মদনপুর-ঝিলিমিলির কাছারি-বাড়ীতে।

ম্যানেজারবাবু তারই জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

মণি তার হাতের ব্যাগটি নামিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে তাঁকে।

ম্যানেজারবাবু তার দিকে তাকালেন। সুন্দর চেহারা ছেলেটার। এরই মধ্যে লম্বা চওড়া বেশ জোয়ান হয়ে উঠেছে সে।

ধপধপ করছে গায়ের রং। মাথায় একমাথা কালো চুল। যেমন স্বাস্থ্য তার তেমনি চেহারা।

—তুমি কি সোজা এইখানেই চলে এলে?

মণি বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—টিউবওয়েল আছে বাথরুমে। যাও হাত মুখ ধুয়ে এসো।

—তার দরকার হবে না। আপনি বলুন কিজন্যে ডাকলেন। আপনার চিঠি পেয়ে আমি তক্ষুণি চলে এসেছি।

—বোসো। বলছি।

মণি বসলো।

ম্যানেজারবাবু সতীশকে বললেন, যাও, চা নিয়ে এসো।

মণি বললে, চা আমি খাই না। আপনি বলুন।

—তুমি কী বলেছ তোমার বাবাকে? বি-এ পাশ করে 'ল' পড়বে?

—ইচ্ছে তো আছে। কিন্তু···

ম্যানেজারবাবু বললেন, আমি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলেছি। তুমি যতদূর পড়তে চাইবে তিনি পড়াবেন।

সারাটা পথ মণি শুধু এমনি ধরনের একটা কথা ভাবতে ভাবতে এসেছে। প্রথমে তাঁর মেয়ে চাঁপাকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন। তার পরেই ডাক পড়েছে তার। সম্ভবতঃ চাঁপার সঙ্গে ম্যানেজারবাবু তার বিয়ে দিতে চান। প্রসঙ্গটা তাই তিনি অন্য এক ভদ্রলোকের নাম দিয়ে উত্থাপন করলেন। ফট্ করে নিজের নামটা বলতে বোধহয় পারছেন না। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো মণি। একটা অভূতপূর্ব আনন্দের অনুভূতি তার সমস্ত হৃদয়-মনকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেললে।

কলকাতার সেদিনের সেই বিকেলটার কথা তার মনে পড়লো। প্রতিদিনের মত সেদিনও চাঁপা আগেই গিয়ে বসেছিল হেদোর সেই গাছের তলায়। কনক-চাঁপা রঙের সিফনের শাড়ীটা পরলে তাকে মানায় ভালো, তাই সেদিনও সেই শাড়ীটা সে পরেছিল, গায়ে ছিল সেই একই রঙের হাত-কাটা জামা, আর রেশমের মত চুলগুলো ছিল এলো করে ঘাড়ের কাছে লট্কানো। কী সুন্দরই না তাকে দেখাচ্ছিল! পড়ন্ত সূর্যের আলো এসে পড়েছিল আজাদ-বাগের জলে আর সেই আলো ঠিকরে পড়ছিল চাঁপার সারা দেহে। হাসতে হাসতে মণি বলেছিল, দেরি হয়ে গিয়েছে, ওঠো।

অন্যদিন বলতে হয় না। সুন্দর মুখের একটি প্রসন্ন হাসি দিয়ে মণিকে অভ্যর্থনা করে চাঁপাই আগে উঠে দাঁড়ায়। সেদিন কিন্তু সে উঠলো না। টানাটানা চোখদুটি তুলে চাঁপা বললে, বোসো। কথা আছে।

মণি তার গা ঘেঁসে বসে পড়তেই চাঁপা তার বুকের তলা থেকে

বের করলে একখানি খামের চিঠি। মণির হাতে দিয়ে বললে, পড়। বাবা লিখেছে।

বেশি কিছু লেখেননি বিনোদবাবু। শুধু লিখেছিলেন, তুমি এসো। বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা আছে তোমার সঙ্গে। এই চিঠি পেয়ে আসতে একদিনও দেরি কোরো না যেন। এখানে দু'চারদিন থাকতে হবে। ছুটি নিয়ে এসো। ভাল জামা-কাপড় যা আছে তোমার—সঙ্গে আনতে ভুলো না।

চিঠিখানা পড়া শেষ করে মণি জিজ্ঞাসা করলে, কখন যাচ্ছ?

—কাল সকালে।

—পার তো গোপালের মন্দির দেখবার ছুতো করে একদিন মদনপুর-ঝিলিমিলিতে যেয়ো। মালার সঙ্গে পরিচয় করে এসো। ভারি খুশী হবে মালা।

চাঁপা বলেছিল, তা নাহয় আসবো, কিন্তু চিঠিখানা পড়ে তোমার কি মনে হচ্ছে?

—কী আবার মনে হবে?

—হাড়-বোকা তুমি একটি গেঁইয়া ভূত! ভাল জামা-কাপড় নিয়ে যেতে বলেছে কেন?

মণি বলেছিল, বা-রে! ম্যানেজারের মেয়ে যাচ্ছে বাবুদের বাড়ীতে। ভাল জামা-কাপড় নিয়ে যেতে বলবে না?

—আজ্ঞে না।—চাঁপা বলেছিল, বাবা বিয়ের কথাবার্তা কয়েছে বোধ হয় কারও সঙ্গে। আমাকে দেখাতে চায়।

মণি বলেছিল, বেশ তো, দেখা দেবে।

—তার পর?

—তার পর? মণি একটু থেমে বলেছিল, বিয়ে করবে।

চাঁপা চট্ করে মণির একখানা হাত দুহাত দিয়ে চেপে ধরে মোচড় দিতে দিতে বলেছিল, কি বললে? বল আর একবার!

হাসতে হাসতে মণি বলেছিল, বিয়ে করবে।

—আবার বল।

—শুনতে ভাল লাগছে বুঝি ?

—হ্যাঁ। বলই না।

হাতে মোচড় খেয়ে মণি চেঁচিয়ে উঠেছিল, আঃ, ছাড়ো ছাড়ো, লাগছে। লাগছে।

চাঁপা তার হাতে আর-একটা পাক দিয়ে বলেছিল, লাগুক্। বল আর বলবে না!

মণি বলেছিল, আচ্ছা আচ্ছা, আর বলবো না। ছাড়ো।

চাঁপা তার হাতটা ছেড়ে দিতেই মণি বলেছিল, কী মেয়ে রে বাবা! নাও চল।

চাঁপা বলেছিল, না, আজ আর কোথাও যেতে আমার মন সরছে না। এইখানেই বসি।

তারপর তাদের পরামর্শ হয়েছিল—এই রকমই যদি হয়, সত্যিই যদি বিনোদবাবু আর-কারও সঙ্গে চাঁপার বিয়ের সম্বন্ধ করে বসেন তো চাঁপা কি করবে ?

মণি বলেছিল, যুগটা যদি আমাদের এই কলিযুগ না হতো তো খোলা তলোয়ার নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে গিয়ে আমি তোমাকে জোর করে কেড়ে নিয়ে আসতাম।

চাঁপা বলেছিল, হাসিরহস্য রাখো। আমি কি করব তাই বল।

মণি বলেছিল, স্বাধীন ভারতের মেয়ে তুমি। কি করবে তাও তোমাকে বলে দিতে হবে? তবে যা কিছু করবে তার আগে ভেবে দেখো—আমি নিতান্ত গরীব এক পূজোরী বামুনের ছেলে। তোমার বাবার আর তোমার দয়ায় আমি আজ বি-এ পড়ছি।

চাঁপা তাকে থামিয়ে দিয়েছিল, আর-কিছু বলতে দেয়নি। বলেছিলো, থামো। ও-সব আমার জানা আছে। জানি আমাদের কষ্টের সীমা থাকবে না। আবার এও জানি—সে-কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা আমার আছে।

মণি বলেছিল, ছাখো, গরীব হয়ে কষ্ট সহ্য করার ভেতর কোনও বাহাদুরী নেই।

—তুমি বড়লোক হতে চাও?

—বড়লোক হয়ত না হতে পারি কিন্তু গরীব হয়ে তোমাকে আমি কষ্ট দিতে চাই না। নিজেও কষ্ট পেতে চাই না। যেমন করে হোক্ তোমাকে আমি বিয়েও করবো, বি-এ পাশ করব, 'ল' পাশ করব।

আজ বিনোদবাবুর কথা শুনে মণির মনে হলো যেন সে-সুযোগটা তিনিই করে দিতে চান!

মণি জিজ্ঞাসা করলে, যিনি আমার পড়ার খরচ দেবেন, কেন দেবেন? কি তাঁর স্বার্থ?

বিনোদবাবু বললেন, তুমি বিয়ে করবে তার মেয়েকে।

মণি আবার জিজ্ঞাসা করলে, আমি কি তাঁকে চিনি?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই চেনো।

মণি এইবার তাঁর নাম জানতে চাইলে। ভেবেছিল বিনোদবাবু কৌশল করে নিজের নামটাই তাকে জানাবেন। কিন্তু আকাশ থেকে সে একেবারে শক্ত মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল—বিনোদবাবু যখন বললেন, তোমাদেরই এই গাঁয়ের ভবতারণ চৌধুরীকে চেনো নিশ্চয়ই।

—চিনি।

বিনোদবাবু বললেন, তার মেয়েকে তুমি বিয়ে করবে, আর তার ছেলে বিয়ে করবে তোমার বোন মালাকে।

মণি মাথা হেঁট করে গুম্ হয়ে বসে রইলো। বিনোদবাবুকে শক্ত কিছু বলবার ক্ষমতা তার নেই। থাকলে হয়ত বলতো। খানিক পরে মুখ তুলে শুধু বললে, আপনি কি এই জন্যেই আমাকে ডেকেছেন?

বিনোদবাবু বললেন, হ্যাঁ, এই জন্যেই। জানি তুমি আমার কথা শুনবে। আর তাছাড়া তোমার বোনটির বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে, দশ জনে দশ কথা বলছে, সেটাও শুনতে কেমন যেন ভাল লাগছে না।

কথাটা মণিরও ভাল লাগল না শুনতে। বললে, মালা বিয়ে করবে না।

—কেন করবে না?

নিজের সম্বন্ধে কিছুই যখন বলতে পারবে না, মণি ভাবলে মালার নাম দিয়ে যাহোক্ কিছু বলে দেওয়া ভাল। বললে, বিয়ে যদি করতেই হয় তো সে এমন একজনকে বিয়ে করবে—যার সঙ্গে বিয়ের কথা কেউ ভাবতেও পারে না।

বিনোদবাবু বললেন, আমি জানি সেকথা। আর জানি বলেই ভবতারণের ছেলের সঙ্গে তার বিয়েটা আগে সেরে দিতে চাই।

মণি বললে, না, আপনি জানেন না।

বিনোদবাবু বললেন, নিশ্চয় জানি। সে আমাদের বড়বাবুর ছেলে নবীন।

মণি কিন্তু বলতে চেয়েছিল অন্য কথা। মালা নবীনকে বিয়ে করতে চায়—সেকথা সে এই প্রথম শুনলে। মালার সঙ্গে নবীনের দেখাই-বা হলো কখন?

মণি উঠে দাঁড়ালো। বললে, আমি বাড়ী যাই।

বিনোদবাবু বললেন, কিন্তু তুমি আমাকে কথা দিয়ে যাও, আমি ভবতারণকে ডেকে তার সঙ্গে পাকাপাকি করে ফেলি।

মণি তাঁর মুখের ওপর 'না' বলতে পারলে না। শুধু বললে, আমাকে একটু ভাববার সময় দিন।

—বেশি সময় কিন্তু আমি দিতে পারব না। তোমাদের বিয়ে দুটো আগে সেরে দিয়ে আমি আমার মেয়ের বিয়ে সারবো।

মণি জিজ্ঞাসা করলে, আপনার মেয়ের বিয়ে কোথায়? কার সঙ্গে?

—আমার মেয়ের বিয়ে নবীনের সঙ্গে।

মণির আর কিছু শোনবার প্রয়োজন নেই। তখন সে সেখান থেকে উঠে পালাতে পারলে বাঁচে।

কিন্তু আবার তাকে ডাকলেন বিনোদবাবু। ফিরে দাঁড়াতে হলো।

বিনোদবাবু বললেন, ছাখো বাবা, আজকালকার ছেলে তোমরা, তোমাদের সঙ্গে কথা বলতেও ভয় করে। তবে তুমি সেরকম নও এই যা ভরসা। তুমি যদি বিয়ের আগে মেয়েটিকে ভাল করে দেখতে চাও, আমি তার ব্যবস্থা করতে পারি।

মণি বললে, আজ্ঞে না, মেয়ে আমি দেখেছি। ভাল নয়।

—ভাল নয় মানে? গায়ের রংটা কালো—এই তো?

মণি বললে, আজ্ঞে না। আমাকে দেখাবার আগে আপনি নিজে একবার ভাল করে দেখবেন।

মণির কথার ধরনটা ভাল বলে মনে হলো না বিনোদবাবুর। ছেলেটা যদি বিগড়ে যায়—তাহলেই তো বিপদ! ওদিকে ভবতারণের লোভ এই ছেলেটির ওপরেই বেশি। মেয়ের বিয়ে হলে তবে সে তার ছেলের সঙ্গে মালার বিয়ে দেবে।

মণি চলে যাচ্ছিল। বিনোদবাবু নিজে উঠে গিয়ে ধরলেন তাকে। চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মণির কাঁধে হাত রেখে বললেন, ছাখো মণি, তোমার ওপর আমার কেমন যেন একটা স্নেহ পড়ে গেছে। নিজের ছেলে নেই, তাই তোমাকে এক এক সময়—যাক্‌গে সেকথা।

বলেই প্রসঙ্গটা সেই খানেই শেষ করে দিয়ে আসল কথাটা পেড়ে বসলেন। বললেন, আর শুধু সেই জন্যেই উপযাচক হয়ে তোমার বোনের বিয়েটা দিয়ে দিতে চাচ্ছি ভবতারণের ছেলের

সঙ্গে। ছেলেটি ভাল। লোহার কারখানায় চাকরি করে। তাছাড়া ভবতারণের অবস্থাও ভগবানের দয়ায় খুব ভাল। তুমি ষ্টুডেন্ট, আর তোমার বাবার ওই তো অবস্থা, এই রকম পাত্রের সঙ্গে আমি মাঝখানে না দাঁড়ালে, তোমাদের সাধ্য ছিল বিয়ে দেবার? কখ্খনো না।

গলাটা খাটো করে বললেন, আর ছাখো, চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়ে লাভ নেই।

মণির আর ইচ্ছে করছিল না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর এই লেক্চার শোনবার। কিন্তু এখানেও সেই ভদ্রতা, এখানেও সেই শিষ্টাচার।

জামার কলারটা চেপে ধরে আছেন ম্যানেজারবাবু। যাঁর দয়ায় তার কলেজের পড়া চলছে, যাঁর মেয়েকে যে ভালবাসে, তিনিই আজ তার সব আশা সব আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ করে দিয়ে অতি বড় নিষ্ঠুরের মত কথাগুলো বলে চলেছেন। মণির মনে হচ্ছে তিনি যেন বেঁধে চাবুক মারছেন তাকে।

অথচ তাঁর কোনও দোষ নেই। এই পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ যেমন নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই জানে না, এই বিনোদবাবুও সেই তাদেরই একজন। স্বার্থে অন্ধ। তাই তিনি আবার বলতে আরম্ভ করলেন, ভবতারণের মেয়ের কথা বলছো? মেয়েটিকে আমি দেখিনি তবে শুনেছি খুব সুন্দরী নয়। ছাখো, তোমরা ছেলেমানুষ, জীবনের অভিজ্ঞতা তোমাদের খুব কম। সুন্দরী অসুন্দরীতে কিছু এসে যায় না। অসুন্দরী স্ত্রী নিয়ে পরমানন্দে জীবন কাটাচ্ছে এও আমার যেমন দেখা আছে, আবার সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে সারাজীবন জ্বলেপুড়ে মরছে—তাও আমি দেখেছি। চোখের সামনেই ছাখো না—সতীশের বড় বৌ। এরকম সুন্দরী মেয়ে সচরাচর নজরে পড়ে না।

বলেই বোধকরি তাঁর মালার কথা মনে পড়লো। বললেন,

হ্যাঁ, তোমার বোন্ মালার কথা ভুলে যাচ্ছিলাম, সেও কম সুন্দরী নয়। কিন্তু সতীশের বৌ-এর কথাটা একবার ভাবো। পারলে ঘর-সংসার করতে? মেয়েটা কত বড় পাজি, কত বড় বজ্জাত জানো? নিজের পেটের ছেলেটাকে এইখানে ফেলে দিয়ে রাক্ষসী মা পালিয়েছে এখান থেকে। তার চেয়ে ওর ওই কালো বৌটা ভাল। দিব্যি কেমন ঘর-সংসার করছে।

ঠিক আছে। বলে মণি এবার এক রকম জোর করেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে হন্-হন্ করে ছুটে বেরিয়ে গেল কাছারি থেকে।

॥ ৭ ॥

চাঁপাকে নিয়ে পড়েছেন বিন্দুবাসিনী—নবীনের মা।

চাঁপা বিয়ে করবে না—এ যেন তার ধনুক-ভাঙ্গা পণ। বড়লোকের একটি মাত্র ছেলে নবীন। শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান এবং সুপুরুষ। বিন্দুবাসিনী বুঝতেই পারছেন না—নবীনকে প্রত্যাখ্যান করবার মত দুঃসাহস তার এলো কোত্থেকে? চাঁপা দাঁড়িয়ে ছিল ঘরের ভেতর। দোতলার যে ঘরটায় তাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে সেই ঘরের একটা খোলা জানলার সুমুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবছিল সে। বিন্দুবাসিনী ঘরে ঢুকলেন। এবার তিনি শেষ চেষ্টা করে দেখবেন। বললেন, ছ্যাখো চাঁপা, তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ নও। কলেজে পড়ছো, কলকাতার মত শহরে অনেক কাল বাস করছো, সবই জানো, সবই বোঝো। তোমার মা নেই, মা থাকলে বিয়ে করব না—এই কথা তুমি বলতে পারতে? কখ্খনো পারতে না। নবীন আমার নিজের ছেলে বলে বলছি না। নবীনের সঙ্গে তোমার বিয়ে হওয়া—মানে অতি বড় ভাগ্যের কথা। এত বড় সৌভাগ্যকে যে-মেয়ে পায়ে ঠেলতে পারে, সে যে কিরকম মেয়ে আমি তো বুঝতে পারছি না বাছা।

চাঁপা জানলার শিকটা নাড়াচাড়া করছিল। এইবার সে-শিকটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে চাঁপা বললে, আমি তা জানি।

—জানবেই তো। জানা তোমার উচিত।

চাঁপা হেঁটমুখে চুপ করে যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়েই রইলো। কোনও কথা বললে না।

বিন্দুবাসিনী বললেন, সবকিছু জেনেশুনেও তুমি বলছো বিয়ে করবে না?

—আজ্ঞে হাঁ। জেনেশুনেই বলছি।

বিন্দুবাসিনী এগিয়ে গেলেন। চাঁপার কাঁধে হাত রাখলেন। বললেন, তোমার কি কোনও রোগ-ব্যাধি আছে? যার ভয়ে বলছো বিয়ে করবে না?

চাঁপা মুখ টিপে কেমন যেন অদ্ভুত রকমের একটা হাসি হাসলে। বললে, আজ্ঞে না।

—তবে? সারা জীবন তুমি বিয়ে না করে কাটিয়ে দেবে?

লজ্জায় মাথা হেঁট করলে চাঁপা। বললে, না, তা হয়ত কাটাতে পারব না।

বিন্দুবাসিনী এবার বোধকরি রাগ করলেন। বললেন, বুঝেছি। নবীনকে তুমি বিয়ে করবে না। তা বেশ, বিয়ের জন্যেই এখানে তোমাকে আনা হয়েছে, বিয়েই যদি তুমি করবে না তাহ'লে আর কেন মিছেমিছি তোমার বাবা তোমার কলেজ কামাই করিয়ে এখানে বসিয়ে রাখলেন। দাঁড়াও তোমার বাবা আসুন, তাঁকে বলি, তিনি তোমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিন। আর তাঁরও তো চাকরি শেষ হয়ে গেছে, আমাদের জমিদারী তো থাকবে না, কাজেই ম্যানেজার রাখারও আর দরকার হবে না। তিনিও যেতে পারেন।

চাঁপা মুখ তুলে তাকালে বিন্দুবাসিনীর দিকে। বললে, আপনার খুব রাগ হয়েছে বুঝতে পারছি। আমার জন্যে আমার বাবাকেও তাড়িয়ে দেবেন বলছেন।

বিন্দুবাসিনী বললেন, না, তা বলিনি। জমিদারী থাকবে না তা বোধহয় তুমি জানো। আমি মিছে কথা বলিনি।

চাঁপা বললে, আমার চেয়ে আপনার ছেলের অনেক ভাল বৌ হবে মা, আপনি দুঃখু করছেন কেন?

—কেন যে দুঃখু করছি বাছা তা তুমি বুঝবে না। আমার ছেলেটিও তো কম নয়। সেও যে ধরে বসেছিল বিয়ে করবে না।

তোমাকে দেখে তার পছন্দ হয়েছিল, ভেবেছিলাম এবার বুঝি বিয়ে করবে।

নবীন ঠিক সেই সময় বারান্দা দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছিল, বিন্দুবাসিনী ডাকলেন, খোকা, শোন্।

নবীন ফিরে দাঁড়ালো, কিন্তু ঘরে ঢুকলো না।

—কি বলছো বল।

বিন্দুবাসিনী বললেন, আমার কি মনে হচ্ছে জানিস?

—কি মনে হচ্ছে?

—মনে হচ্ছে তুই শিখিয়ে দিয়েছিস এই মেয়েটাকে।

—কী শিখিয়ে দিয়েছি মা?

বিন্দুবাসিনী বললেন, শিখিয়েছিস, ও বলবে বিয়ে করবে না আর তুই বলবি বিয়ে করবো।

—তুমি বিশ্বাস কর মা, সত্যি বলছি—এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি—

পা ছুঁতে হলে ঘরে ঢুকতেই হয়। নবীন ঘরে ঢুকে সত্যি সত্যিই মায়ের পায়ে হাত দিয়ে বললে, এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি—চাঁপার সঙ্গে আমার কোনোরকমের কোনও কথা হয়নি।

—তাহ'লে মেয়েটা এরম বলছে কেন?

নবীন চাঁপার দিকে তাকিয়ে বললে, মেয়েটাই জানে।

এমন সময় হরি এসে খবর দিলে, ম্যানেজারবাবু এলেন।

সবাই একসঙ্গে উদগ্রীব হয়ে উঠলো। বিন্দুবাসিনী বললেন, ডাকো তাঁকে। তাঁর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

—ডাকতে হবে না মা। আজকের রাতটি এখানে থেকে আমি আবার কালই চলে যাব ঝিলিমিলিতে। আপনি ভাবছেন বলে আমি নিজেই চলে এলাম খবরটা দিতে।

বলতে বলতে ম্যানেজারবাবু এসে দাঁড়ালেন। নবীনের দিকে

তাকিয়ে বললেন, তুমি একটু সরে যাও তো নবীন। তোমার মার সঙ্গে আমার কিছু গোপন কথা আছে।

নবীন সরে যেতেই বিনোদবাবু বললেন, ওখানে আমাকে একটি মস্ত বড় সমস্যার মীমাংসা করে আসতে হলো। আবার যেতে হবে। কেন তাই বলছি শুনুন। আপনার গোপাল-মন্দিরের পূজোরী সেই কালা ভৈরব—

বিন্দুবাসিনী বললেন, বলুন। তাকে আমি খুব ভাল করেই চিনি। নবীনের বাবা তাঁকে খুব ভালবাসতেন।

—তার একটি মেয়ে আছে জানেন?

—জানি। বিয়ের যুগ্যি মেয়ে।

বিনোদবাবু বললেন, শুধু তাই নয়। মেয়েটি পরমাসুন্দরী। সেখানে গিয়ে শুনলাম—ওই কালা পূজোরীটা আমাদের নবীনের সঙ্গে মেয়েটাকে ভিড়িয়ে দিতে চায়। তাই আমি নিজে গেলাম সেদিন নবীনকে ডাকতে। গিয়ে যা দেখলাম—থাক্‌গে সে-কথা আপনার শুনে কজে নেই।

বিন্দুবাসিনী বললেন, না বাবা, নবীন তো আমার সে রকম ছেলে নয়।

ম্যানেজারবাবু বললেন, আমি নিজে দেখেছি মা। নিজের চোখকে তো অবিশ্বাস করতে পারি না। তাই আমার ভয় হলো ফট্‌ করে নবীন না বলে বসে পূজোরী বামুনের ওই মেয়েটাকে বিয়ে করবে।

বিন্দুবাসিনী বললেন, তাই যদি করে তো করুক।

বিন্দুবাসিনীর কথাটা ভাল লাগলো না ম্যানেজারবাবুর। ম্যানেজারবাবু একেবারে হাঁ-হাঁ করে উঠলেন—যেন কতই-না সর্বনাশ হয়ে গেল। বললেন, কী বলছেন মা? হতদরিদ্র ওই পূজোরী বামুনের মেয়ে আসবে আপনার বাড়ীতে বৌ হয়ে? থাক্‌গে, সে-পথ আমি বন্ধ করে দিয়েছি। ওই গ্রামেই ভবতারণ

বলে এক ভদ্রলোকের একটি ছেলের সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ করে দিয়েছি। ভবতারণের একটি মেয়েও আছে। ভবতারণ ধরে বসলো—তাহ'লে আমার মেয়েটিকেও পার করে দিন। সেই তারই ব্যবস্থা করতে আমার দেরি হয়ে গেল। সতীশকে কলকাতায় পাঠিয়ে ভৈরবের ছেলে মণিকে আনালাম। মণির সঙ্গে সেই মেয়েটির বিয়ের ব্যবস্থা করে দিলাম। কাল আবার যাব। গিয়ে এই দুটো বিয়ে চুকিয়ে দিয়ে এখানে এসে নবীনের আর চাঁপার বিয়ে দেবো।

বিন্দুবাসিনী একটু হাসলেন। বললেন, কার বিয়ে দেবেন? আপনার মেয়ে চাঁপার? তবেই হয়েছে! আপনার মেয়ে কি বলছে শুনুন। এখানে এসে অবধি সেই এক জেদ ধরে বসেছে—বিয়ে সে করবে না।

বিনোদবাবু তাকালেন তাঁর মেয়ের দিকে।

চাঁপার মুখখানা হঠাৎ যেন শুকিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে শুনলে—মণিকে কলকাতা থেকে আনানো হয়েছে লোক পাঠিয়ে।

আনানো হয়েছে বিয়ে দেবার জন্যে। তার বাবাই আনিয়েছে তাকে। তার বাবাই তার বিয়ের ব্যবস্থা করেছে।

ম্যানেজারবাবু বললেন, চাঁপা, আবার সেই জেদ ধরে বসেছিলি?

চাঁপা কোনও কথাই বললে না।

ম্যানেজারবাবু বিন্দুবাসিনীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মা। এখন শুধু নবীনকে জিজ্ঞাসা করুন। সে যদি রাজী থাকে তো চাঁপার জন্যে ভাববেন না।

বিন্দুবাসিনী বললেন, নবীন রাজী হয়েছে।

ম্যানেজারবাবু অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। বললেন, বাস, আর আমি কিছু ভাবি না। তাহ'লে এদের বিয়েটা তো আগেই সেরে দিতে পারি।

বিন্দুবাসিনী বললেন, নবীনকে আর-একবার আপনি ভাল করে জিজ্ঞাসা করুন।

সেই ভালো।

মনের আনন্দে বিনোদবাবু তাঁর নিজের ঘরে গিয়ে বসলেন। হরিয়াকে বললেন, নবীনকে একবার ডেকে দিবি তো বাবা।

নবীন কিন্তু চাঁপা মেয়েটাকে বুঝতে পারছে না কিছুতেই।

এই বয়সের মেয়েরা বিয়ের নামে উল্লসিত হয়ে উঠে। উদ্দাম যৌবনের একটা মাদকতা আছে, উন্মাদনা আছে, কিন্তু সে সমস্তকে অবদমিত করবার এমন কী শক্তি সে পেয়েছে যার জন্য আজ সে তাকে উপেক্ষা করে বলছে, বিয়ে সে করবে না।

মানুষের এই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাকে সংযমে সংযত করতে পারে একমাত্র প্রেম।

মেয়েটা নিশ্চয়ই প্রেমে পড়েছে কারও। নিশ্চয়ই কাউকে সে ভালবেসেছে।

ম্যানেজারবাবুর সব কথাই সে শুনেছে লুকিয়ে লুকিয়ে।

মানুষের ভালবাসার কোনও মর্যাদাই তিনি দিতে চান না। ছেলেমেয়ের বিয়েটা তাঁর কাছে ছেলেখেলা। যেমন হোক্ যাকে হোক্ একটা জুটিয়ে দিলেই হলো। নইলে ভবতারণের ছেলের সঙ্গে মালার, আর তার মেয়ের সঙ্গে মণির বিয়ে দিয়ে তিনি নিজের কন্যার পথ নিষ্কণ্টক করতে চাইতেন না কখনও।

সেদিন বন্দুক দিয়ে গাছ থেকে আম পাড়বার দৃশ্যটা তিনি দেখেছেন। দেখেছেন মালাকে বন্দুক চালাতে শেখাচ্ছে সে। দেখবামাত্র তাঁর ভয় হয়েছে—নবীন হয়ত চাঁপাকে বিয়ে করতে চাইবে না।

তাই তিনি তাঁর এই অত্যাচার চালিয়েছেন নিরীহ দুটি প্রাণীর ওপর।

এই কথা ভাবছিল নবীন। এমন সময় হরি এসে বললে, ম্যানেজারবাবু ডাকছেন।

—বল্‌গে যা পরে দেখা করবো।

এই কথা বলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল সে। বাড়ীতে থাকলে এক্ষুনি হয়ত' তিনি নিজে চলে আসবেন। তার চেয়ে পালিয়ে যাওয়াই ভাল।

প্রকাণ্ড বাড়ী। বাড়ীর ফটকের সুমুখে মস্ত বড় বাগান। পাশেই বাঁধানো পুকুর।

বাগানের পথে যেতে যেতে হঠাৎ তার মনে হলো, কে যেন পুকুরের ঘাটে বসে রয়েছে তাদেরই বাড়ীর দোতলার জানলার দিকে তাকিয়ে। লোকটা ওরকম করে ওখানে বসে বসে কি দেখছে ?

নবীনের কেমন যেন সন্দেহ হলো। এগিয়ে গেল সেই দিকে।

কিন্তু তার কাছ পর্যন্ত যাবার দরকার হলো না। নবীন দেখলে সদরের উত্তর দিকে অন্দরমহলে যাবার যে-দরজাটা আছে, সেই খানে দাঁড়িয়ে হরি-চাকর উঁকি-ঝুঁকি মারছে। কোথায় যেন সে যাচ্ছিল, নবীনকে দেখে ঢুকে পড়লো।

নবীন ডাকলে, হরি !

হরিকে বাধ্য হয়ে দোরের কাছে মুখ বাড়িয়ে থমকে দাঁড়াতে হলো।

—চোরের মত উঁকি-ঝুঁকি মারছিস কেন ? কি হয়েছে ?

হরি যেন ধরা পড়ে গেল। থতমত খেয়ে বললে, কই কিছুই তো—না, কিছুই তো হয়নি।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, পুকুরের ঘাটে বসে আছে ও বাবুটি কে ?

হরি এবার সত্যিই বিপদে পড়লো। বললে, ও আমাকে বলতে বারণ করেছে দাদাবাবু।

নবীন বললে, আমাকেও বলবি না? আচ্ছা বোকা তো! বেশ, তাহ'লে আমি যাই ওর কাছে।

হরি হাঁ হাঁ করে হাত বাড়িয়ে নিষেধ করলে। বললে, আপনাকে বলতেই তো বারণ দাদাবাবু। শুনুন তাহ'লে। ও আপনার ঝিলিমিলির গোপাল-মন্দিরের সেই যে ভৈরব পূজোরী তার ছেলে।

—মালার দাদা মণি। তাই বল্! তা ওখানে বসে কেন?

হরি বললে, ম্যানেজারবাবুর মেয়েকে একখানা চিঠি দিয়েছিল।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় সে চিঠি?

—দিয়ে দিয়েছি।

—চিঠি পেয়ে চাঁপা কি বললে?

হরি তার হাতের মুঠোটা খুলে দেখালে একটুকরো সাদা কাগজ। কাগজে ছোট ছোট অক্ষরে চাঁপা লিখেছে।—'ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি তোমাদের বাড়ী। ইতি। তোমারই আমি।'

হরির হাতটা থর থর করে কাঁপছিল। খুব ভয় পেয়ে গেছে বেচারা।

নবীন হাসলো। বললে, যা দিগে যা। আমি যে জেনে ফেলেছি কাউকে বলিসনি।

হরি যেন বেঁচে গেল।

মণি পাছে টের পায় নবীন তাই আর বাইরে বেরুলো না। অন্দরমহলের দরজা দিয়েই বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়লো। তার বুক থেকে গুরুভার একটা বোঝা যেন নেমে গেল আজ। এতক্ষণে সে বুঝতে পারলে কিসের জোরে চাঁপা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

ম্যানেজারবাবুর খুশীর আর সীমা নেই। ঝিলিমিলির কাছারি-

বাড়ীতে ক'টা দিন তাঁর কি দুশ্চিন্তাতেই না কেটেছে! একবার ভবতারণের খোসামুদি, একবার ভৈরবের খোসামুদি, সতীশকে কলকাতায় পাঠানো, তার ওপর মণির সঙ্গে বোঝাপড়া। আজকালকার কলেজের ছাত্র, সে কি আর সহজে বুঝতে চায়? দু'একদিনের সময় নিলে ভাবতে! ভাবুক্।

মরুক্‌গে যাক্। এখন একেবারে নিশ্চিন্ত। নবীন যখন চাঁপাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে, তখন আর ভৈরবের ছেলে মেয়ের বিয়ে হলো আর না হলো—তাতে তাঁর কিছু এসে যায় না। চুলোয় যাক্ ভবতারণ! তার পেত্নীর মতন মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না তো তিনি কি করবেন? দেখা হলে বলে দেবেন—ভৈরবের ছেলে মণি রাজী হলো না বিয়ে করতে। তিনি অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি করেননি।

ম্যানেজারবাবু তাঁর আলমারি খুলে গরদের পাঞ্জাবীটি বের করলেন। সাদা থানের ধুতির ওপর গরদের পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে বিকেল বেলা এলেন অন্দরমহলে বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে কথাবার্তা পাকাপাকি করে ফেলতে। এই মাসেই বিয়েটা তিনি সেরে ফেলবেন। তার পর চাঁপাকে যদি পড়তে দিতে চান তার শাশুড়ীঠাকৃরুণ, তাহ'লে পাঠাবেন কলকাতায়, নইলে সে এইখানেই থাকবে।

বিন্দুবাসিনী জিজ্ঞাসা করলেন, দেখা হয়েছে নবীনের সঙ্গে?

—ওবেলায় ডেকেছিলাম, কিন্তু বিয়ের কথা বলতে হবে বলে বোধহয় লজ্জায় দেখা করেনি।

বিন্দুবাসিনী বললেন, না বাবা, আজকালকার ছেলেমেয়েদের লজ্জা-শরম কিছু নেই। আপনার মেয়েটা কি আমাকে কম ভুগিয়েছে! তাকেও ডাকুন।

ম্যানেজারবাবু এখানে ছিলেন না বলে অন্দরমহলের একটা ঘরে তাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে। ঘরটা নবীনের ঘরের কাছেই।

বিন্দুবাসিনী ভেবেছিলেন—কাছাকাছি থাক্‌। দুজনের ভাবসাব হয় যদি তো হোক্‌!

বিন্দুবাসিনী তাকেও ডাকতে যাচ্ছিলেন, ম্যানেজারবাবু নিষেধ করলেন। বললেন, না মা, ওকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। ওর জন্যে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

নবীনকে ডাকতে হলো না, সে নিজেই এলো। বললে, ওবেলায় আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি গিয়েছিলাম আপনার ঘরে। সেখানে আপনাকে দেখতে না পেয়ে এখানে আসছি। কী জন্যে ডেকেছিলেন?

ম্যানেজারবাবু জবাব দেবার আগেই তার মা জবাব দিলেন।

—কি জন্যে ডেকেছেন তুমি বুঝতে পারছ না?

এবার বেশ জোরের সঙ্গেই নবীন বললে, তোমাকে তো বলেছি মা, আর কতবার বলবো?

ম্যানেজারবাবু বললেন, এখানে আমি আজ দশ বৎসর চাকরি করছি। আজ আমার কাজের পুরস্কার আমি পেয়ে গেলাম।—এবার বলুন মা, আমাকে কি দিতে হবে?

বিন্দুবাসিনী নবীনের মুখের দিকে তাকালেন। নবীন বললে, কিচ্ছু দিতে হবে না। মেয়ের বাপের কাছ থেকে একটি পয়সাও আমি নেব না।

আনন্দে ম্যানেজারবাবুর কেঁদে ফেলবার মত অবস্থা। মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরুচ্ছে না তাঁর।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ম্যানেজারবাবু বললেন, ভবানীপুরে আমার পৈতৃক বাড়ী আছে। সেখানে আমার ভাইএরা থাকে। আমরা তিন ভাই। একটা অংশ আমার আছে। ধরো সেখান থেকেই যদি বিয়ে হতো, বিয়ের সব খরচই আমাকে করতে হতো।

বিন্দুবাসিনী জিজ্ঞাসা করলেন, বিয়ে কি তাহ'লে এই বাড়ীতেই হবে?

ম্যানেজারবাবু বললেন, হ্যাঁ মা, আমি আর দেরি করতে চাই না। আমি কি ভেবেছি শুনুন। নবীনের বিয়ে—টিম্ টিম্ করে সেরে ফেললে বদনাম হবে। আপনার 'গেষ্ট্ হাউস' হবে কনের বাড়ী। আর এই বাড়ী তো বরের বাড়ী আছেই। বিয়ের দিনের যাবতীয় খরচ আমার। বৌভাতের খরচ আপনার। ভালই হবে। গ্রামের লোক আপনার ছেলের বিয়েতে ছুদিন নেমন্তন্ন পাবে।

বিন্দুবাসিনী বললেন, আপনাকে আমি আর কি বলবো! আজ যদি ধরুন নবীনের অন্য কোথাও বিয়ে হতো, আপনাকেই সব কিছু ব্যবস্থা করতে হতো। তখন যা করতেন, এখনও তাই করুন। তবে আমার বলবার কথাও একটা আছে।

ম্যানেজারবাবু বললেন, বলুন।

বিন্দুবাসিনী বললেন, নবীনের বাবা নেই, জমিদারী চলে যাচ্ছে। ক্ষতিপূরণ পাব কিনা জানি না। একটি পয়সাও যদি না পাই—কিছু বলবার উপায় নেই। নিজেদের রাজত্ব, ইংরেজ নয় যে তেড়ে মারতে যাব। কাজেই ছেলের বিয়েতে হৈ হৈ করে টাকা খরচ করাটাকে আমি অপব্যয় বলেই মনে করছি। তুই কি বলিস নবীন?

নবীন বললে, আমি তো কোনও খরচই করতে রাজী নই।

ম্যানেজারবাবু বললেন, না তা চলবে কেন? তাহ'লে আমি আর কলকাতায় আমার ভাইদের কিছু জানাব না। বিয়ের দিন গ্রামের সব লোকজনদের ভাল করে খাইয়ে দিই। তার পর বৌভাতের দিন আপনি যা ভাল বুঝবেন করবেন।

—বিয়েটা তাহ'লে হচ্ছে কখন? বিন্দুবাসিনী জিজ্ঞাসা করলেন।

ম্যানেজারবাবু বললেন, আসছে শুক্রবারে বিয়ের একটি ভাল দিন আছে। আমি বলি কি, বিয়েটা ওই দিনই হোক্।

বিন্দুবাসিনী সম্মতি দিলেন।

বিয়েটা যদি আজ রাত্রেও হয়ে যায়—ম্যানেজারবাবুর কোনও আপত্তি নেই। জমিদারের একটিমাত্র ছেলে নবীনের সঙ্গে তাঁর একমাত্র কন্যার বিবাহ! এই কল্পনাতীত সৌভাগ্যের দিনটি যদি এসেই গিয়ে থাকে তো সেটা যত তাড়াতাড়ি আসে আসুক্।

এই আনন্দে আত্মহারা হয়ে ম্যানেজারবাবু বিয়ের ব্যবস্থায় মন দিলেন। নবীনকে কি কি দেবেন তার ফর্দ হয়ে গেল। চেন-ঘড়ির আজকাল রেওয়াজ নেই, কাজেই খুব দামী একটি রিষ্টওয়াচ দেবেন। সোনার ব্যাণ্ড্ দেবেন। হীরের আংটি দেবেন একটি, জামার বোতাম দেবেন। ছাতা ছড়ি জুতো, ধুতি জামার তো কথাই নেই। এ-সবের জন্যে তিনি নিজেই বললেন, কাল পরশু যেদিন হোক্, সুলতানপুরে যাবেন একবার গাড়ীটা নিয়ে। সেখানে মস্ত বড় বাজার। কলকাতার দরেই জিনিসপত্র সবই পাওয়া যায়। মেয়ের জন্যে কি কি আনতে হবে তারও ফর্দ করলেন। বাকি রইলো আরও কিছু গয়না। সে-সব বিয়ের পর দিলেই চলবে। কলেজে-পড়া মেয়েরা গয়না বড়-একটা পরতে চায় না।

না চাইলে কি হবে, এত বড় জমিদারের বৌ, গয়না না দিলে লোকে বলবে কি? একবার তো অন্তত গয়না পরিয়ে লোকজনের সামনে বের করতে হবে!

ম্যানেজারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ওর পড়ার কি হবে মা? বিয়ের পরও কি ও পড়বে?

বিন্দুবাসিনী বললেন, নবীন যা বলবে তাই হবে।

নবীন বললে, যেমন পড়ছে তেমনি পড়বে। বি-এ পাশ ওকে করতেই হবে।

বিন্দুবাসিনী হাসলেন।

ওদিকে বিধাতাও যে মনে মনে হাসছিলেন সে খবর কেউ জানলো না।

বাড়ীর ভেতর জানলে মাত্র দুজন। হরি-চাকর আর নবীন।

সেদিন সন্ধ্যার আগেই হরি এসে নবীনকে চুপিচুপি কি যেন বললে। নবীন মুখ টিপে একটু হেসে বললে, ঠিক আছে।

কথাটা জানাজানি হলো পরের দিন সকালে।

ম্যানেজারবাবু তাঁর সেই পুরনো দিনের গলা বের করে চেঁচিয়ে বাড়ী মাৎ করে দিলেন। ঝি চাকর রাঁধুনী, ড্রাইভার দারোয়ান, সবাইকে বকে বকে একশা করতে লাগলেন।

—'এত বড় একটা মেয়ে এত বড় বাড়ী থেকে কখন্ বেরিয়ে চলে গেল তোমরা কেউ টের পেলে না?'

টের পাবে কেমন করে?

চাঁপা তো পর্দানসীন মেয়ে নয়! নিজের ইচ্ছেমত এখানে যাচ্ছে, ওখানে যাচ্ছে, বাগানে বেড়াচ্ছে, পুকুরে স্নান করছে, সে যে এমন করে সবাইকার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাবে কে জানতো?

বিন্দুবাসিনী বললেন, আমারই ভুল হয়েছিল। অন্দরমহলের একটেরে ওকে যে ওই ঘরটায় একা থাকতে দেওয়া উচিত হয়নি। আমি ভাবলাম—যাক্‌গে, সেকথা আর বলে কাজ নেই। ভালই হয়েছে, নবীনকে বিয়ে করবার ইচ্ছে ওর ছিল না। আপনাকে তো বললাম আমি।

ম্যানেজারবাবু বললেন, ও বললেই আমি শুনবো? আমি বাপ, আমি ওর ভাল-মন্দ বুঝবো না? ও একটু লেখাপড়া শিখছে বলেই একেবারে এত স্বাধীন হয়ে গেল?

নবীন বললে, একটি মাত্র মেয়ে, একটু বেশি আদর দিয়েছেন বোধহয়।

—তা অবশ্য দিয়েছি। কিন্তু না, এ আমি বরদাস্ত করব না কিছুতেই।

নবীন বললে, করা উচিত নয়।

চাঁপা একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছে। চিঠি অবশ্য তাকে

বলা যায় না। একটা সাদা কাগজের টুকরোর ওপর এক লাইন লেখা।

'বাবা, আমি কলকাতায় চলে যাচ্ছি। বিয়ে আমি করব না।'

নবীন বললে, আমি কলকাতা থেকে তাকে ধরে আনছি। ঠিকানাটা দিন।

ম্যানেজারবাবু বললেন, তুমি পারবে না বাবা। আমি যাচ্ছি। তুমি বরং সুলতানপুর থেকে আমার এই ফর্দ-মাফিক্ তোমার আর চাঁপার এই জিনিসগুলো আনবার ব্যবস্থা করে দাও। বিয়ে আমি ওর দেবোই।

রূপোর আর কাঁসার বাসনের দান দিতে হবে। তার ফর্দ ছিল আর-একটা কাগজে। ম্যানেজারবাবু সেটাও ধরিয়ে দিলেন নবীনের হাতে। আর দিলেন নগদ তিন হাজার টাকার নোট।

—এত কেন?

—এর কম হবে না বাবা।

যে-ম্যানেজারবাবুর কাছ থেকে টাকাপয়সা সহজে বের করা যায় না সেই তিনিই আজ মুক্তহস্ত। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অর্থ এবং তাঁর সারা জীবনের সঞ্চয় আজ তিনি ব্যয় করে ফেলতে চান তাঁর কন্যার বিবাহে।

বললেন, সকালের প্যাসেঞ্জারে যদি গিয়ে থাকে, তাহ'লে আমি তাকে ধরে ফেলবো জংসন-ষ্টেশনে। আর যদি তার আগে এক্সপ্রেসে চলে গেছে তাহ'লে কলকাতা থেকে ধরে আনছি। সবই আমি বলে গেলাম সরকারকে। অন্যান্য ব্যবস্থা সবই সে করে রাখবে।

এই বলে তিনি রওনা হয়ে গেলেন।

তিনি বেরিয়ে যাবার পরেই নবীন ডাকলে, হরি, ছাখ্ তো বাবা, ভাত-টাত কিছু হয়েছে কিনা! যদি হয়ে থাকে তো আমাকে চারটি খাইয়ে দে। বেরোতে হবে।

হরির মুখে খবর পেয়ে মা এলেন।

—তুই আবার কোথায় বেরোবি?

—আমাকে যে এক গাদা কাজের ভার দিয়ে গেলেন উনি।

—সে-সব কাজ সরকারকে দিয়ে হয় না?

—না। সুলতানপুর যাব। সেখান থেকে যাব ঝিলিমিলি।

—ঝিলিমিলি কেন?

নবীন বললে, তোমার ছেলের বিয়ে, কাছারিতে নেমন্তন্ন করবে না? তাছাড়া তোমার গোপাল-মন্দিরের পূজোরী বেচারা ভৈরব তো তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে পাগল।

ভৈরবের কথা যখন উঠলো—বিন্দুবাসিনী বললেন, তোকে গোপন করে ম্যানেজারবাবু একটা কথা আমাকে বলেছেন। আজ আর সেকথা বলতে দোষ নেই। হাঁ রে, ভৈরবের মেয়েটি কি খুব সুন্দরী?

নবীনের মুখে একটু হাসি দেখা গেল। বললে, সেরকম সুন্দরী মেয়ে খুব কম দেখা যায়।

—তুই নাকি তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলি?

—কই না তো!

মা বললেন, ম্যানেজারবাবু তাহ'লে ভুল দেখেছেন।

নবীন বললে, দেখবেনই তো। মেয়েটা যে ওঁর মেয়ের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী।

মা একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন।—'ভৈরব কি মেয়েটার বিয়ে দিতে পারবে?'

নবীন বললে, মেয়েটা বোধহয় বিয়েই করবে না। গোপাল গোপাল করেই পাগল!

বিন্দুবাসিনীর আগ্রহ যেন বেড়ে গেল। বললেন, আসবার সময় গাড়ীতে বসিয়ে পারিস তো নিয়ে আসবি। বিয়ের সময়

এখানে থাকবে, আবার বিয়ের পর গোপালকে আমরা যখন প্রণাম করতে যাব, তখন আমাদের সঙ্গে যাবে।

—বলে দেখবো।

বিন্দুবাসিনী বললেন, মেয়েটার বিয়ের জন্যে কিছু টাকা ভৈরবকে দিতে হবে। তোর বাবা ওকে খুব ভালবাসতো।

নবীন বললে, ভৈরব সেকথা বলেছে আমাকে।

বিন্দুবাসিনী বললেন, মানুষটা ভাল।

নবীন বললে, ওর স্ত্রীও বোধহয় ভাল ছিলেন।

—কি জানি বাবা, দেখি নি।

—দেখবার দরকার হয় না মা। নবীন বললে, ছেলেমেয়েকে দেখলেই বাপ-মা দু'জনকেই চেনা যায়।

সুলতানপুরের বাজারে নবীন গেল না। গাড়ী নিয়ে সোজা গিয়ে উঠলো ঝিলিমিলিতে। ড্রাইভার ভেবেছিল গাড়ী কাছারিতেই যাবে, তাই সে ষ্টেশনের পাশে গাড়ীটা ঘুরিয়ে নিয়ে কাছারির রাস্তাই ধরেছিল, নবীন বললে, কাছারিতে যাব না। পুজোরী ভৈরব আচার্য্যের বাড়ীতে চল।

গাড়ীর হর্ণের আওয়াজ শুনে মালা ছুটে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। আমগাছের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলো।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, তোমার দাদা কোথায়?

—সেকথা কি এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলতে হবে? দয়া করে এলেন যখন, ভেতরে চলুন।

এবাড়ীর সবই নবীনের জানা হয়ে গেছে। ঘরের ভেতরে গিয়ে বসতেই মালা বললে, ক'দিন আমার কী ভাবনাতেই না কেটেছে! দিনরাত শুধু গোপালকে ডেকেছি।

—গোপাল কি বললে?

—এই যে। আপনাকে পাঠিয়ে দিলে।

—তোমার গোপাল আমাকে পাঠিয়েছে কিনা জানি না, আমি এসেছি নিজের গরজে।

—গরজটা কি শুনি!

—চাঁপাকে নিতে এসেছি।

—চাঁপা এখানে আছে আপনাকে কে বললে?

—আমি জানি।

—জানেন তো খুঁজে বার করে নিন। এই তো ক'খানা মাত্র ঘর।

নবীন সত্যিই উঠে দাঁড়ালো। খুঁজে দেখলে ঘর ক'খানা। কোথাও নেই। চাঁপাও নেই। মণিও নেই।

—কোথায় লুকিয়ে রেখেছ বল। নবীন হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলে।

মালাও হাসলে। বললে, ধেৎ, লুকিয়ে কেন রাখবো?

—লুকিয়ে রাখা অভ্যেস তোমার আছে। সুধাকে তুমি লুকিয়ে রেখেছিলে।

মালার ঠোঁটের হাসি তখনও মিলোয়নি। বললে, এখনও মনে আছে দেখছি!

—চিরকাল মনে থাকবে।

এই বলে নবীন তার মুখের দিকে তাকালো।

নিতান্ত দরিদ্র এক পূজারী ব্রাহ্মণের কন্যা। লেখাপড়া বিশেষ কিছুই জানে না। বাংলা পড়তে পারে আর লিখতে পারে শুধু। ইস্কুলের ধার-পাশ মাড়ায়নি কখনও। তবু কেমন যেন একটি শুচিশুভ্র মার্জিত পরিচ্ছন্নতা আছে এর আচারে ব্যবহারে। আর-একটি বস্তু আছে—সেটি কোথায় আছে ঠিক ধরা যায় না; কখনও মনে হয় তার কালো দুটি চোখের তারায়, কখনও মনে হয় সুন্দর সুবিন্যস্ত ওই দাঁতের সারিতে, কখনও মনে হয় অপরূপ দুটি

ঠোঁটের কিনারে, আবার কখনও মনে হয় তার সর্ব অবয়বে মিশে আছে একটি দুরতিক্রম্য রহস্য—যার কোনও কূল-কিনারা নেই। সেটি দেখা যায় না, শুধু অনুভব করা যায় তার দুর্দমনীয় আকর্ষণে।

এমনি রহস্যময়ী আর-একটি নারী ছিল তার পাশে, তাই এত ভাল করে নবীনের সেটি নজরে পড়েনি। আজ তাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে বড় নির্লজ্জ মনে হলো তার নিজেকে। চোখ ফিরিয়ে নিলে সেদিক থেকে।

বললে, না না, বল তারা কোথায় আছে।

মালা বললে, চাঁপা তো কলকাতায় গেছে। সেকথা অবশ্য জানিয়ে এসেছে তার বাবাকে।

নবীন বললে, তাই বুঝি তার বাবা ছুটেছে কলকাতায়।

—আর আপনি? আপনি এখানে এলেন কেন?

নবীন বললে, আমি জানি তার কলকাতার পথ এইদিকে।

—জানেন?

মালার ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি হাসি দেখা গেল।

নবীন বললে, জানি।

—জানেন তো বসুন এইখানে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলা যায় না।

এই কথা বলে মালা তার হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে নিজেও বসলো তার পাশে।

—বিপদের কথা শুনুন তাহ'লে বলি। চাঁপা মেয়েটিকে আমি আগে দেখিনি। কাল দেখলাম। তার আগেই অবশ্য আমি মণির কাছে শুনেছি সব।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, মণিকে তুমি দাদা বল না?

—কখনও বলি, কখনও বলি না। আমরা দু' বছরের ছোট বড়।—তারপর শুনুন কি হলো। খুব কসে বকলাম মেয়েটাকে। বললাম, তোমার বাবার কাছ থেকে ভিক্ষে করে যে-ছেলে লেখাপড়া শিখছে, বাপ যার পুজোরী বামুন, সাধ-আহ্লাদ দূরের

কথা, দুমুঠো খেতে দেবার ক্ষমতা যার নেই, সেই গরীব ছেলেটার শুধু চেহারা দেখে তুমি ভালবেসে ফেললে? দুদিন বাদে যখন পুরনো হয়ে যাবে তখন বুঝবে মজা! কেঁদে কেঁদে মরবে। এমনি সব আরও অনেক কথাই বললাম। খাইয়ে দাইয়ে নিজের কাছে নিয়ে শুলাম। অনেক বড় বড় কথাও বললাম।

নবীন বললে, বড় বড় কথা? বল কি বললে।

লজ্জায় মালা তার চোখ দুটো নামিয়ে নিলে। বললে, থাক্ আর বলবো না। আপনি ঠাট্টা করছেন।

—না না, ঠাট্টা করিনি। তুমি বল।

মালা বললে, বললাম, নবীনবাবু রাজার ছেলে, লেখাপড়া জানেন, দেখতে শুনতে ভাল, তিনি যখন বিয়ে করতে চেয়েছেন তখন তাকেই বিয়ে কর্, রাণী হয়ে থাকবি, সুখে থাকবি।

—এই কথা বললে?

—হ্যাঁ, বললাম। বললাম, নবীনবাবু ভালবাসা-টালবাসার ধার ধারেন না, তোর গায়ের রংটা যখন ফরসা আর বয়েসটাও যখন কম, তখন এইটেই তোর উপযুক্ত জায়গা।

নবীন বললে, ভালবাসার ধার ধারি না আমি? এই কথা তুমি বলতে চাও?

—হ্যাঁ, চাই। নইলে ভবতারণকে লেলিয়ে দিতে পারেন—তার ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার জন্যে?

নবীন বললে, আমি তো ভবতারণের ব্যাপার কিছুই জানি না মালা, সে-সব করেছেন—

কথাটা শেষ করতে দিলে না মালা। বললে, করেছেন আপনার ম্যানেজার—চাঁপার বাবা।

—কিন্তু কেন করেছেন জানো তো?

—জানি।

বলতে গিয়ে লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল মালার মুখখানা। বললে,

উনি ভেবেছিলেন আপনি বুঝি আমাকে বিয়ে করতে চাইবেন। সেদিন ওই আমগাছের তলায় আমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখে ওঁর ধারণা হয়ে গিয়েছিল, আমি আপনাকে ভালবাসি।

বলেই তার ঢলঢলে চোখ দুটি নামিয়ে নিলে মালা। মনে হলো মালার সুন্দর মুখে কে যেন একমুঠো আবির ছড়িয়ে দিলে।

নবীন কিন্তু কি ভেবে জানি না, হাল্‌কা পরিহাসের ছলে বলে বসলো, সত্যি নাকি? সত্যিই কি তুমি আমাকে ভালবাসো?

মালা হঠাৎ তার সমস্ত লজ্জা যেন ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তার সেই ফোটা ফুলের মত অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি তুলে সোজা হয়ে বসলো। তারপর নবীনের দিকে তাকিয়ে বললে, হ্যাঁ, বাসি। বাসি। বাসি। আমি আপনাকে ভালবাসি। তাই যদি না বাসবো তো আজ আমার এই বিপদের দিনে আপনার পথ চেয়ে বসে থাকবো কেন?

—তোমার আবার বিপদ কিসের?

—বিপদ নয়? আপনি যে-মেয়েকে বিয়ে করতে চান, আমার ভাই বলছে কিনা সেই মেয়েকেই ভালবাসে!

—কে বললে আমি ওই মেয়েকে বিয়ে করতে চাই?

—চাঁপা নিজে বলেছে।

বলতে বলতে মালার ঠোঁট দুটি থর থর করে কেঁপে উঠলো। বললে, এখনও আপনি আমাকে—

আর কিছু সে বলতে পারলে না। চোখ দুটো তার জলে ভরে আসতেই মালা সেখান থেকে উঠে দোরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

—এ তো বেশ বিপদে পড়লাম দেখছি। নবীন আপন মনেই বলে উঠলো, এক করতে এলাম আর হয়ে গেল আর-এক কাণ্ড।

মালা তার আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছে ফিরে দাঁড়ালো।

—কী করতে এলেন? চাঁপাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তো?

—কথাটা শোনো আগে। আমাকে তো কিছু বলতেই দিচ্ছ না!

—নিন, বলুন কি বলবেন।

নবীন বললে, ভেবেছিলাম তোমাকেও জানাবো না। কিন্তু কেঁদে কেটে একশা করে তুমি যে কাণ্ড করলে, এখন তোমাকে না জানিয়ে আর পারছি না।

মালা বললে, আপনার দয়া।

নবীন এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললে, শুনছে না তো ওরা কোথাও লুকিয়ে লুকিয়ে ?

মালা বললে, না। ওদের আমি পাঠিয়ে দিয়েছি সুতোহাটিতে —সুধার কাছে।

—তাই বল !

সুধার নামে নবীনের মুখখানা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললে, খুব ভাল কাজ করেছ। সুধার কাছ থেকেই চাঁপাকে আমি ধরে নিয়ে যাব আমাদের বাড়ীতে।

মালা বললে, পারবেন না। সে যাবে না কিছুতেই।

—বুঝিয়ে-সুজিয়ে নিয়ে যাব। তোমরাও বলবে। তুমি বলবে, সুধা বলবে, তাহ'লেই যাবে।

—তারপর ?

নবীন বললে, মণির সঙ্গে ম্যানেজারবাবু তাঁর মেয়ের বিয়ে কিছুতেই দিতে চাইবেন না।

মালা বললে, সেকথা ওরাও জানে।

—আমি কিন্তু যেমন করে হোক্ বিয়েটা দিয়ে দেবো।

মালা ম্লান একটু হাসলে। বললে, সেকথা আমিও ভেবেছিলাম। আপনার সঙ্গে বিয়ের কথাটাকে অগ্রাহ্য করে চাঁপা যখন তার সুটকেশটি হাতে নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো, ওর প্রচণ্ড ভালবাসার কাছে মাথা আমার হেঁট হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম, সুধার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে ওদের বিয়ে দিয়ে দিই। কিন্তু তার পরের কথাটা ভেবে আর কিছু কূল-কিনারা পাইনি। মেয়েটাকে

বুঝিয়েছি, বকেছি আর সারারাত ধরে গোপালকে ডেকেছি। বলেছি—তুমি নবীনবাবুকে একটিবার পাঠিয়ে দাও আমার কাছে! আমি তাঁকেই জিজ্ঞাসা করি—আমি কি করবো।

নবীন বললে, আমিও চাঁপাকে কম পরীক্ষা করিনি। ক্রমাগত বলেছি—আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। মেয়েটা এক চুল নড়েনি। বলেছে, বিয়ে সে করবে না। তখনও বুঝতে পারিনি—মনের এ-জোর সে কোথায় পেলে। তারপর দেখেছি মণি গেছে আমাদের বাড়ীতে। আমার চাকরকে একটি টাকা ঘুষ দিয়ে লুকিয়ে দেখা করতে চেয়েছে চাঁপার সঙ্গে। দেখা করতে পারেনি। চিঠি পাঠিয়েছে। চাঁপা তার জবাব দিয়েছে। লুকিয়ে লুকিয়ে সব আমি দেখেছি। ম্যানেজারবাবুকে মিছেমিছি আটকে রেখেছি। মাকে জানতে দিইনি। দারোয়ান চাকর সবাইকে বলে দিয়েছি—চাঁপাকে যেন না আটকায়। নইলে চাঁপার মত একটা মেয়ে দুর্গের মত আমাদের ওই বাড়ী থেকে চুপিচুপি বেরিয়ে আসতে পারে কখনও?

মালা চুপ করে শুনলে সব-কিছু। বললে, সবই বুঝলাম। বিয়েও না-হয় আপনি দিয়ে দিলেন। কিন্তু আপনি জানেন কি—মণির পড়ার খরচ কে জোগায়?

নবীন বললে, আমাদেরই সেরেস্তা থেকে মাসে দশটি করে টাকা দিতেন ম্যানেজারবাবু। এখন আর দেন না। মণি প্রাইভেট পড়িয়ে নিজের খরচ নিজে চালায়।

—না। মিছে কথা। মণির সে প্রাইভেট ছাত্রীটি কে জানেন? চাঁপা। চাঁপাকে তার জন্যে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে বেশি পাঠান তার বাবা। সেই টাকায় মণির পড়ার খরচ চলে।

নবীন বললে, এখনও তেমনি চলবে।

মালা বললে, রাগ করে চাঁপার পড়া যদি বন্ধ করে দেন তার বাবা?

মালার একখানি হাত চেপে ধরে নবীন বললে, এই তোমার হাতে হাত দিয়ে আমি বলছি মালা, মণির পড়ার ভার আমি নিলাম। সে বি-এ পাশ করবে, এম-এ পাশ করবে, ল' পাশ করবে, উকিল হবে, মেলা টাকা রোজগার করবে, তারপর মনের মত একটি পাত্রের সঙ্গে তার এই বোনটির বিয়ে দেবে।

মালা তার হাতটি টেনে নিয়ে বললে, আবার সেই কথা? বিয়ে আমি করব না।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, তাহ'লে চাঁপার মত তুমিও কাউকে ভালবেসেছ নাকি?

মালা ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে, না। অত সহজে আমি কাউকে বিশ্বাস করি না।

নবীন বললে, যাকগে, তোমার কথা তুমি বুঝবে। আমি এখন সুধার কাছে যাচ্ছি চাঁপাকে আনতে। তুমি আমার হাতে হাত রেখে বল—আমার একটি কথা রাখবে?

—কি কথা?

—আসছে-শুক্রবার বিকেলে তুমি তোমার বাবাকে আর মণিকে আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবে!

—মণিকে না-হয় পাঠিয়ে দেবো, এই আপনার হাতে হাত দিয়েই বলছি। কিন্তু—

বলে নবীনের হাতে হাত রেখে মালা বললে, বাবা চলে গেলে আমি একা কেমন করে থাকবো এ-বাড়ীতে?

তাও তো বটে! কিন্তু বরের বাপ না গেলেই-বা চলে কেমন করে?

মালার নরম হাতের চাঁপা ফুলের মত আঙুলগুলি নাড়তে নাড়তে নবীন বললে, আচ্ছা, তুমিও যদি যাও তোমার বাবার সঙ্গে? আমি আমার গাড়ীটা চুপি-চুপি পাঠিয়ে দেবো।

—ফাঁকা এই বাড়ীটা ফেলে রেখে ? জানেন না তো—আপনার এই জমিদারীতে কতগুলি চোর পুষে রেখেছেন আপনি !

এই বলে হাসতে হাসতে মালা বললে, পরের দিন বাড়ী ফিরে এসে দেখবো—বাড়ীর দেয়াল ক'খানা ছাড়া আর কিছুই নেই।

নবীনের মুখখানা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, এ আবার কি কথা বলে আমার মনটাকে অন্যদিকে টেনে নিয়ে গেলে মালা ? এ শুধু আমার জমিদারীতে নয়, সব জায়গায়, সর্বত্র, সারা দেশটা ভরে গেল এই সব চোর-ছ্যাঁচড় আর নীচ স্বার্থপর মানুষে। শিক্ষাদীক্ষা যাদের হলো না—তারা রইলো নিরাভরণ হয়ে—কথায়-বার্তায় আচারে-আচরণে ধরা পড়তে লাগলো সকলের কাছে। আর যারা শিক্ষিত হলো—টাকা রোজগার করে ওপরে উঠলো, তারা শিখলো শুধু কেমন করে মনের সেই জানোয়ারটাকে লুকিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু আসলে সেই একই রইলো। একই জানোয়ার বিভিন্ন মূর্তিতে সমাজে বিচরণ করতে লাগলো। রক্তের ধারা বেয়ে এই রক্তবীজের বংশ বেড়েই চলতে থাকে। একে বাধা দেবার ক্ষমতা কোনও ওষুধের নেই, কোনও বিদ্যালয়ের নেই। সর্বনাশা এই ব্যাধির বীজ মানুষ জন্মসূত্রে তার রক্তের মধ্যে যদি একবার পেয়ে যায় তো সে প্রাণপণ চেষ্টা করেও নিজেকে আর পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না।

কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিল মালা। নবীন থামলো। বললে, মনের আবেগে খানিকটা বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম মালা। এই সব কথা যখন ভাবি তখন আর আমার জ্ঞান থাকে না।

মালা জিজ্ঞাসা করলে, এর কি কোনও প্রতীকার নেই ?

—আছে। নবীন বললে, আমার জ্ঞান-বুদ্ধি আর কতটুকু ! জানি না আমি ভুল বলছি কিনা। আমার মনে হয় যেন আছে। আছে প্রেমে। আছে ভালবাসায়। স্বামী স্ত্রীর ভেতর যদি ভালবাসা থাকে, তাহ'লে তাদের সেই ভালবাসার সন্তানেরাই

পারে পরিপূর্ণ মানুষ বলে নিজেদের পরিচয় দিতে, তারাই পারে দেশের এই সর্বনাশা কলঙ্ক মোচন করতে। তাদের চোখমুখের চেহারাই হয় আলাদা, মনের চেহারা হয় ফুলের মত পবিত্র সুন্দর।

মালা তার চোখ দুটো কয়েকবার তুললে আর নামালে। মনে হলো কি যেন সে বলতে চাচ্ছে অথচ বলতে পারছে না। নবীন সেটা দেখেও যেন দেখলে না। সে তার মনের আবেগে বলে যেতে লাগলো, এইটেই আমার মনের দৃঢ় বিশ্বাস। পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ যখন পেয়েছি তখন সে সুযোগ আমি ছাড়ব না। চাঁপার আর মণির বিয়ে আমি দেবোই।

চাঁপা আর মণির কথা উঠতেই মালা যেন তার মনের কথা বলবার একটা সুযোগ পেলে। বললে, বয়েসের দোষে অন্য কোনও জিনিসকে ভালবাসা বলে ভুল করছে না তো ওরা?

এইরকম একটা কথাই বোধকরি এতক্ষণ সে বলতে চেয়েছিল।

নবীন বললে, না, এদের বেলা বোধহয় তা' সত্যি নয়। মণিকে আমি এখনও ভাল করে দেখিনি, তবে চাঁপাকে দেখে, চাঁপার কথা শুনে মনে হয়েছে—ভাল ও সত্যিই বেসেছে।

মালার মনের সংশয় যেন কিছুতেই মিটছে না। সে আবার বলে বসলো, একজন ভালবাসে, আর-একজন বাসে না—এমনও তো হয়?

নবীন বললে, হতে পারে। এখানে সবই সম্ভব। ভাল বাসা না হয়ে যদি ভাল লাগাও হয়, তবু আমি তার মর্যাদা দিতে প্রস্তুত। ভাল লাগার নেশা থাকে চোখে, আর ভালবাসার অমৃত থাকে হৃদয়ে। আজকাল দেখছি, পশুধর্মী মানুষ হৃদয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেই চাচ্ছে না। চোখ দিয়ে দেখছে, কান দিয়ে শুনছে, কিন্তু হৃদয় দিয়ে কোনো কিছু অনুভব করছে না। এই হৃদয়-রাজ্যের

রাজা হলো গিয়ে প্রেম। তাই প্রেমের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনও পথ নেই।

এই সব কথা শুনতে শুনতে মালা যেন সত্যিই অভিভূত হয়ে গেল। চোখ বুজে চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগলো।

নবীন তার হাতখানা ছেড়ে দিয়েছিল অনেক আগেই। আবার সে হাত বাড়িয়ে তার হাতে হাত দিতেই মালা যেন চমকে উঠলো। চোখ খুলে তাকাতেই নবীন জিজ্ঞাসা করলে, কি ভাবছো?

—ভাবছি ভালবাসার কথা।

বলেই ম্লান একটু হাসলে মালা। হেসে বললে, হাতের মুঠোর মধ্যে যাকে পাওয়া যায় তাকে বোধহয় ভালবাসি না। তাকে ভাল লাগে। ভালবাসি আমার গোপালকে।

এই বলে আবার সে চোখ বুজলো।

নবীন বোধহয় তাকে একটু পরীক্ষা করতে চাইলে। বললে, যাকে তুমি জীবনে কোনোদিন পাবে না, যে তোমার নাগালের বাইরে—তাকেই তুমি ভালবাসো?

মালা চট্ করে বলে বসলো, সুধাও তো আপনার নাগালের বাইরে।

বলেই সে উঠে দাঁড়িয়ে পালাচ্ছিল সেখান থেকে।

নবীন চমকে উঠলো তার কথা শুনে। সর্বনাশ! এ-কথা সে বললে কেমন করে? সুধা কি সব কথা বলেছে তাকে?

নবীন দোরের কাছে গিয়ে তাকে ধরে ফেললে। হাতখানা তার চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করলে, সুধার কথা কেন বললে তুমি?

মালা বললে, যা সত্যি তাই বলেছি।

—কে বললে সত্যি? সুধা বলেছে কিছু?

—মেয়েদের বলতে হয় না। মেয়েরা বুঝতে পারে।

কথা তখনও তাদের শেষ হয়নি। এমন সময় নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে তাদের আবার একবার চমকে দিয়ে সুমুখে

দোরের কাছে এসে দাঁড়ালো সুধা আর তার দু'পাশে দু'জন। একপাশে মণি, আর একপাশে চাঁপা।

মালার হাতখানা ছেড়ে দিলে নবীন। বললে, তুমি চলে এলে সুধা ?

সুধা হেসে উঠলো। বললে, খুব অন্যায় করলাম ?

—না। আমি যাচ্ছিলাম তোমার ওখানে।

—কেন ? সুধা হেসে বললে, বিয়ের নেমন্তন্ন করতে ?

নবীন বললে, হ্যাঁ। চাঁপার সঙ্গে আমার বিয়ের সব ঠিক করে ফেলেছেন ম্যানেজারবাবু।

—ছ্যাখো তো, এমন সুন্দর বর, আর চাঁপা কি-না পালিয়ে এলো বিয়ে করবে না বলে ? কোথায় গেলি ?—চাঁপা!

মালা বললে, পালিয়েছে।

—মালাকে নিয়ে সুধাও চলে গেল হাসতে হাসতে।

বাকি রইলো শুধু মণি।

মাথা হেঁট করে পায়ে হাত দিয়ে মণি প্রণাম করলে নবীনকে।

দুহাত বাড়িয়ে নবীন তাকে তুলে ধরলে। তুলেই তার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো।

হ্যাঁ, তাকিয়ে থাকবার মত মুখ বটে। মালার দাদা বলেই মনে হয়। প্রিয়দর্শন, স্বাস্থ্যসুন্দর যুবক। চওড়া বুকের ছাতি, টানাটানা দুটি চোখ।

মণির দুই কাঁধে দুটি হাত রেখে নবীন বললে, বেশি কথা বলবার সময় নেই। তুমি ছেলেমানুষ নও। যা করেছ নিজের দায়িত্বেই করেছ। এর জন্যে ভবিষ্যতে কোনোদিন অনুতাপ করবে না তো ?

মণি বললে, না।

সুদৃঢ় পুরুষালী কণ্ঠস্বর।

নবীন বললে, শোনো। আসছে-শুক্রবার বিয়ে। বিকেলে

আমার গাড়ীটা চুপি-চুপি পাঠিয়ে দেবো। তোমার বাবাকে নিয়ে তুমি চলে যাবে আমার বাড়ীতে।

—বাবাকে নিয়ে যেতে হলে আপনার গোপাল-মন্দিরে পূজোরী ঠিক করে যেতে হবে।

—তাই যাবে।

—কিন্তু একটা কথা ছিল।

মণি সহজে বলতে পারছিল না কথাটা। মাথা হেঁট করে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। নবীন বললে, বল না! লজ্জা কিসের?

মণি বললে, মালার বিয়ের কোনও ব্যবস্থা এখনও হলো না, তাই ভাবছিলাম—

কথাটা শেষ করতে পারলে না। নবীন বললে, বুঝেছি। কিন্তু এমন সুযোগটি আর পাব না।

মণি কি বলছে?

সুমুখে তাকিয়ে দেখে, সুধা পাশের ঘর থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছে।

নবীন বললে, চেঁচিয়ে বলতে পারব না। এখানে এসে শোনো।

সুধা এগিয়ে এলো।—'কী এমন গোপন কথা, যা চেঁচিয়ে বলতে পারবে না?'

মণির কথাটা নবীন জানালে সুধাকে।

সুধা মণির দিকে তাকিয়ে বললে, বোনের ওপর দরদ তাহ'লে আছে দেখছি! হায়রে কপাল! এমনি একটা দাদা যদি আমাদের থাকতো তো বেঁচে যেতাম! আচ্ছা মণি, নিজে তো বেশ ভাল করে দেখে-শুনে যাচাই করে একটি মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছ, আর মালা বুঝি বিয়ে করবে ভবতারণের ছেলেকে?

মণি বললে, আমি তো সে কথা বলিনি!

সুধা বললে, বেশ, তাহ'লে বোনকে জিজ্ঞাসা কর—ভাই-এর মত সেও কাউকে ভাল-টালো বেসেছে কিনা!

এই বলে সে নবীনকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, আমাদের এই জমিদারবাবুটি তো ভালবাসার বিশেষজ্ঞ। বিয়ের আগে ভাব-ভালবাসা না হ'লে তিনি তো কারও বিয়েতে মতই দেবেন না!

নবীন বললে, কথাটা একেবারে মিথ্যা বলনি। কিন্তু মালা ভালবাসতে পারে সে রকম ছেলে কেউ এ-গ্রামে আছে বলে তো মনে হয় না।

—গ্রামের মেয়েগুলোর ওই তো হয়েছে মুস্কিল! সুধা হাসতে হাসতে বললে, তোমার কথামত দেশের ছেলেমেয়েগুলোকে যদি ভালবেসে বিয়ে করতে হয়, তাহলে গ্রামের মেয়েগুলোকে শহরে নিয়ে গিয়ে ছেলেদের গাদায় ছেড়ে দিতে হবে।

নবীন বললে, কিছু করতে হবে না। গ্রামের চেহারা এরকম থাকবে না। গ্রামের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখবে, গ্রামের চেহারা একেবারে বদলে যাবে।

—থাক্ তাহ'লে মালা সেই অনাগত দিনের আশায়। কিন্তু বেচারা ততদিনে বুড়ী হয়ে যাবে। থাক্‌গে, সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না, তুমি যা করছো করগে যাও। মালার ভাবনা আমি ভাববো।—তুমি কি আজই নিয়ে যাবে চাঁপাকে?

নবীন বললে, হ্যাঁ, আজই। ম্যানেজারবাবু কলকাতা থেকে ফেরবার আগেই।

—মণিও যাবে তো এই সঙ্গে?

নবীন বললে, চুপ। আস্তে বল। চাঁপা শুনতে পাবে।

সুধা হো হো করে হেসে উঠলো।—'তুমি কি ভেবেছ, চাঁপাকে সত্যি কথাটা জানাবে না? তুমি নিজে বিয়ে করবে বলে তাকে ধরে নিয়ে যাবে?'

নবীন বললে, হ্যাঁ, বেশ মজা হবে।

—পারবে নিয়ে যেতে?

—কেন পারবো না?

—কখখনো পারবে না। চাঁপা সে-মেয়েই নয়। তুমি যে তাকে বিয়ে করবে বলে প্রথমদিন থেকে তার সঙ্গে অভিনয় করেছ তা সে জানে। সে জানে, তোমার বাড়ী ছেড়ে লুকিয়ে এখানে পালিয়ে আসতে তুমিই তাকে সাহায্য করেছ, আর এও সে জানে—আজ হোক্ কাল হোক্ একবছর পরে হোক্, মণিকে বিয়ে করতে তুমিই তাকে সাহায্য করবে। তোমার ওপর তার অসীম শ্রদ্ধা।

নবীন খুশী হলো। বললে, মণির ভাগ্যটা তাহ'লে ভালই বলতে হবে। বল তাহ'লে ওকে তৈরী হতে।

সুধা বললে, দাঁড়াও, মালা খাবার তৈরি করছে। না খাইয়ে ছাড়বে না। মণি, ছাখো তো কতদূর হলো।

মণিকে সরিয়ে দিয়ে সুধা বললে, যাক্, তুমি তাহ'লে একটা কাজের মত কাজ পেয়েছ।

নবীন বললে, তা পেয়েছি। শোনো, তোমাকেও এ ক'টা দিন এখানে থাকতে হবে।

—বলছো যখন, থাকবো।

ম্যানেজারবাবুর-দেওয়া টাকা থেকে পাঁচশ' টাকা বের করে সুধার হাতে দিয়ে নবীন বললে, শুক্রবারদিন বিয়ে। রবিবার মণি আর চাঁপা এখানে ফিরে আসবে। এই টাকা দিয়ে গেলাম তোমার হাতে, তুমি ওদের বৌ-ভাতের আয়োজন করে দিও।

সুধা জিজ্ঞাসা করলে, মণিও কি যাচ্ছে তোমাদের সঙ্গে ?

—না। মণি যাবে শুক্রবার বিকেলে।

চাঁপা হাসতে হাসতে নবীনের গাড়ীতে গিয়ে উঠলো। বললে, বাবাকে যা বলতে হয় আপনি বলবেন কিন্তু।

নবীন বললে, তোমার ভয় কিসের ? তুমি তো আমাকে বিয়ে করতে যাচ্ছ।

চাঁপা হো হো করে হেসে উঠলো।

এমন হাসি এই মেয়েটির মুখে নবীন একদিনও দেখেনি। তার মন ছিল মেঘাচ্ছন্ন। আজ সে মেঘ গেছে কেটে। কাজেই তার মুখে হাসি ফুটেছে। প্রসন্ন প্রফুল্ল মন তার খুশীর আলো ফেলেছে সারা মুখে—সর্ব অবয়বে। চাঁপাকে যেরকমটি দেখেছিল, তার চেয়েও সুন্দরী বলে মনে হচ্ছে নবীনের। মনের আনন্দ মানুষের মুখে-চোখে যখন ফুটে বেরোয়, তখন এমনিই হয়।

নবীন মনে মনে ভগবানের কাছে তার নীরব প্রার্থনা জানালে—দেশের সব তরুণ-তরুণীর মুখগুলি যেন আনন্দে এমনি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

গাড়ী গিয়ে যখন দাঁড়ালো নবীনের বাড়ীর সদরে, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়। বাড়ীতে আলো জ্বলেছে।

বিন্দুবাসিনী শুনলেন নবীন ফিরে এলো। তাড়াতাড়ি সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়াতেই দেখলেন, নবীনের পেছনে ম্যানেজারবাবুর মেয়ে চাঁপা।

—ও মা! মেয়েটা তাহ'লে কলকাতা যায়নি!

নবীন বললে, না। ঝিলিমিলিতে ছিল।

—কোথায় ছিল? ভৈরবের বাড়ীতে?

—হ্যাঁ, ওর ছেলে মণির সঙ্গে পড়ে যে!

চাঁপা এসে প্রণাম করলে বিন্দুবাসিনীকে। বিন্দুবাসিনী আশীর্বাদও করলেন না, গায়েও হাত দিলেন না। হরি দাঁড়িয়েছিল চাঁপার সুটকেশটা হাতে নিয়ে। বিন্দুবাসিনী বললেন, যাও, ওর ঘরে নিয়ে যাও। ওর বাপ তো কলকাতায় ছুটেছে। আসুক, এসে যা করতে হয় করুক্!

হরির পিছু পিছু চাঁপা চলে গেল অন্দরমহলের দিকে।

নবীন ডাকলে, মা!

—কী?

নবীন বললে, চাঁপা তাহ'লে তোমার বৌ হোক—তুমি চাও না?

বিন্দুবাসিনী বললেন, না বাবা, সাতজন্ম তোমার যদি বিয়ে না হয় তো না হোক্! ওর কি কম খোসামুদি করেছি আমি?

বলেই তিনি চলে যাচ্ছিলেন নিজের ঘরের দিকে।

নবীন বেঁচে গেল। মাকে তাহ'লে আসল কথাটা বলে দেওয়াই ভাল। সেও যাচ্ছিল মার পিছু পিছু।

বিন্দুবাসিনী ফিরে দাঁড়ালেন।—'হাঁরে খোকা, তুই আবার ওকে বাড়ীতে আনতে গেলি কেন? তোর কি ওকেই বিয়ে করবার ইচ্ছে?'

নবীন বললে, তোমার কি মনে হয় মা?

—মনে আবার হবে কি? যে-মেয়ে তোকে বিয়ে করতে চায় না, সে-মেয়েকে তুই বিয়ে করবি কেমন করে?

—তবে সত্যি কথাটা শোনো মা, তোমার গোপাল-মন্দিরের পূজোরী ভৈরবের ছেলে মণিকে ও বিয়ে করতে চায়।

বিন্দুবাসিনী বললেন, সেই ভাল। ওর বাপ আসুক্, এলে বল্ তাকে। যদি ইচ্ছে হয় তো তারই সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিক্। তুই ওর ভেতর থাকিস না।

নবীন বললে, বেশ, তাই হবে।

—কিন্তু তোর কি হবে? তুই কি এই নিয়েই মেতে থাকবি?

নবীন বললে, এ ঝামেলা তো আমি জোটাইনি মা, ম্যানেজার-বাবুকে বলে তার মেয়েটাকে তুমিই আনিয়েছ।

সত্যিই তো। তিনিই আনিয়েছেন চাঁপাকে। কাজেই তাঁর আর কিছু বলবার নেই।

তিনি আবার বললেন, তুই কি বিয়ে করবি না তাহ'লে ?

—এই ঝামেলাটা চুকুক্, তার পর বলবো।

—না বাবা, আমার আর অপেক্ষা করবার সময় নেই। হয় আমি এই মাসেই তোমার বিয়ে দেবো, আর নয়তো সবকিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে কাশী চলে যাব।

—আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। বলেই সেখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল নবীন, মা তাকে ফিরে ডাকলেন।—'হাঁরে নবীন, ভৈরবের সেই মেয়েটি—সেই যে গোপাল গোপাল করে, তাকে গাড়ীতে তুলে আনলি না কেন ?'

নবীন বললে, ভাবলাম একবার বলি, কিন্তু, সে-ই তোমার গোপাল-মন্দিরের কাজকর্ম সবই করে, তার ওপর বাড়ীর রান্নাবান্না আছে, বোধহয় আসতে পারবে না ভেবেই আর বললাম না। কেন মা ? তুমি কি ওকে তোমার বৌ করবার কথা ভাবছো নাকি ?

মা বললেন, না, তা ভাবিনি। আমাদের গোপালকে যে এত ভালবাসে তাকে একবার চোখে দেখব না ?

—চাঁপার বিয়েটা চুকুক্, তারপর—

—চাঁপার বিয়ে ? সে কি এই শুক্রবারেই হবে নাকি ? ভৈরবের সেই ছেলেটার সঙ্গে ?

—হ্যাঁ মা, এই শুক্রবারেই হবে।

—তুই কি সেই ব্যবস্থা করেছিস নাকি ?

—করবো না ? ওরা দুজনকে ভালবাসে যে !

—ভালবাসার মুখে আগুন ! তা তুই এর মধ্যে থাকতে গেলি কেন ? ম্যানেজারবাবু দেখবি কিছুতেই বিয়ে দিতে চাইবেন না। উনি সেই এক কথা ধরে থাকবেন—তোর সঙ্গে বিয়ে হোক্।

—আমি করলে তো !

বিন্দুবাসিনী বললেন, করবি না তো পালিয়ে যা বাড়ী থেকে।

নবীন বললে, তবেই হয়েছে! আমি পালিয়ে গেলে এ-বিয়েটাও হবে না।

—তাহ'লে বিয়ের দিন আমাকে পালাতে হবে। নইলে দেখবি ম্যানেজার আমাকে ছিঁড়ে খাবে।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় যাবে তুমি?

—ভজুডিতে গিয়ে বসে থাকব আমার সেই ভাইঝির কাছে।

নবীন হেসে উড়িয়ে দিলে কথাটা।—'তুমি কি পাগল হয়েছ মা? তোমাকে পালাতে হবে কেন? আমি সব ঠিক করে দেবো দেখো। ম্যানেজারবাবু আসুন।'

ম্যানেজারবাবু এলেন একেবারে বিয়ের দিন বিকেলে।

মণি আর মণির বাবা তখন ঝিলিমিলি থেকে এসে গেছে।

ম্যানেজারবাবু না এলেও কোনও ক্ষতি ছিল না, নবীন বিয়ের সব ব্যবস্থাই ঠিক করেছিল। ম্যানেজারবাবু নাই যদি আসেন, নবীন ভেবেছিল, নিজের দায়িত্বেই মণির সঙ্গে চাঁপার বিয়েটা সে এই লগ্নে চুকিয়ে দেবে। কন্যা সম্প্রদান করবে সে নিজে।

ম্যানেজারবাবু একেবারে হতাশ হয়ে বাড়ী ঢুকেছিলেন।

মেয়েকে হোস্টেলে না পেয়ে কলকাতা শহরের যেখানে যেখানে চাঁপার যাবার সম্ভাবনা সব জায়গায় তিনি গিয়েছিলেন। প্রতিটি হাসপাতালে দেখেছেন—পুলিশে খবর দিয়েছেন, তারপর দুদিন অপেক্ষা করে একেবারে নিরাশ হয়ে গিয়ে মেয়েকে গালাগালি দিতে দিতে এখানে ফিরে এসেছেন বিয়ের দিনে।

মেয়েকেই যখন পাওয়া গেল না তখন আর বিয়ে কিসের?

কিন্তু এখানে এসে যখন চাঁপাকে ফিরে পেলেন তখন তাকে তিরস্কার করবেন না বুকে জড়িয়ে ধরবেন কিছু বুঝতে পারলেন না।

যতই হোক্ তাঁর ওই একটিমাত্র মেয়ে।

জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় ছিল?

নবীন বললে, ঝিলিমিলিতে।

ম্যানেজারবাবু বললেন, সে সন্দেহও যে আমার না হয়েছিল তা নয়।

সন্দেহটা আরও ঘনীভূত হয়ে গেল যখন দেখলেন—মণিকে বরের বেশে সাজিয়ে নবীন নিজে এনে বসিয়ে দিলে বিয়ের ছাদ্‌নাতলায়।

বিন্দুবাসিনী ঠিকই বলেছিলেন।

ম্যানেজারবাবু চমকে উঠলেন। চম্‌কে উঠেই 'আসছি' বলে 'মা' 'মা' বলে একেবারে এ-বাড়ীতে এসে হাজির।

নবীনের গাড়ীখানা নিয়ে বিন্দুবাসিনী তার আগেই উধাও।

কখন গেছে নবীনও টের পায়নি। তবু বললে, মা ভজুড়ি যাব বলছিল করুণাদির কাছে—কার যেন অসুখ।

মা ও ছেলের ষড়যন্ত্র ভেবে ম্যানেজারবাবু গুম হয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন চাঁপার কাছে। চাঁপার মুখের দিকে একবার তাকালেন। মেয়ের মুখে প্রসন্ন একটি হাসির আভাস দেখতে পেলেন তিনি। মেয়ের যখন সম্মতি আছে তখন আর বলবার কিছু নেই। গভীর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার ছাদ্‌নাতলায় ফিরে গিয়ে বসলেন। বললেন, ঠিক আছে। আমার আর কিছু বলবার নেই।

দান-সামগ্রী আর কাপড়-জামা কেনবার জন্যে যে তিন হাজার টাকা নবীনের হাতে তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন, নবীন সেই টাকা ম্যানেজারবাবুর হাতের কাছে বাড়িয়ে ধরে বললে, নিন, ধরুন।

—কী ধরবো?

—আপনি যে তিন হাজার টাকা আমাকে দিয়েছিলেন সেই টাকা।

ম্যানেজারবাবু কি যেন ভাবলেন। ভাবলেন—নবীন তা'হলে

আগে থেকেই ঠিক করেছিল—চাঁপাকে বিয়ে সে করবে না, তারই অনুগ্রহপুষ্ট তার ঠাকুর-বাড়ীর পুরোহিত নিতান্ত দীনহীন ভৈরবের ছেলের সঙ্গেই চাঁপার বিয়ে দিয়ে নিজে সরে দাঁড়াবে। নবীনের মায়েরও এতে সম্মতি ছিল। নইলে তিনিই-বা ঠিক এই সময়টিতেই বাড়ী ছেড়ে চলে যাবেন কেন? অসুখ-বিসুখ কারও কিছু করেনি। গাড়ী নিয়ে মিছেমিছি তাঁর বোনের বাড়ী যাচ্ছেন বলে চলে গেছেন। বিয়েটা চুকে গেলেই ফিরে আসবেন।

নিজেকে খুব অসহায় বলে মনে হয়েছিল তাঁর। বিয়েটা তিনি অনায়াসে বন্ধ করে দিতে পারতেন, শুধু দিলেন না চাঁপার মুখের দিকে তাকিয়ে।

চাঁপার মুখে হাসি দেখে তাঁর সব দুঃখ মুহূর্তের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেল। যার জন্য এত কাণ্ড, সেই মেয়েরই যখন এতে সম্মতি আছে তখন আর তাঁর আপত্তি করবার কিছু নেই।

টাকাগুলো ফিরিয়ে নিতে ম্যানেজারবাবু ইতস্তত করছিলেন।

নবীন আবার বললে, নিন, টাকাটা ধরুন। এর থেকে পাঁচ শ' টাকা আমি দিয়ে এসেছি বৌ-ভাতের জন্যে।

টাকাটা তিনি হাত দিয়ে স্পর্শ পর্যন্ত করলেন না। বললেন, মণির বাবার হাতে দাও, ওইটেই আমার বরপণ।

নবীন ভেবেছিল, এত সহজে রাজী তিনি হবেন না। বিবাহিত জীবনে প্রেমের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেক-কিছু বোঝাতে হবে তাঁকে। হয়ত-বা অনেক লম্ফ-ঝম্প করবেন, কিন্তু কিছুই যখন তিনি করলেন না, তখন ভাবলে, মা তার মিছেমিছি কোথায় গিয়ে লুকিয়ে বসে রইল! তার না গেলেও চলতো।

কিন্তু সত্যি কি চলতো?

বোধ হয় চলতো না।

জীবন-বিধাতা তখন আর-এক চাল চেলেছেন।

চাঁপার সঙ্গে মণির বিবাহ নির্বিঘ্নে চুকে গেছে।

পরের দিন সকালে বাবুদের বাড়ীর বাগানে অজস্র ফোটা ফুলের ওপর সকালের রৌদ্র যেন লুটোপুটি খাচ্ছে। ফটকের পেটা ঘড়িতে আটটা বাজলো।

গেষ্ট-হাউসের দোতলার একখানা ঘর খুলে দেওয়া হয়েছিল নববিবাহিত দম্পতি চাঁপা ও মণির জন্যে। ড্রেসিং-মিরারের সামনের ছোট টুলের ওপর বসে চাঁপা হাত দিয়ে তার চুলগুলো ঠিক করে নিচ্ছিল, মণি শুধু গেঞ্জি গায়ে দিয়ে খাটের ওপর বসে বসে কথা বলছিল।

—তোমার বাবা যদি বলেন পড়তে হবে না—তুমি শুনো না। তোমাকে বি-এ পাশ করতেই হবে।

চাঁপা বললে, যো হুকুম মহারাজ!

নীচের তলার একটা ঘরে পাশাপাশি দু'খানা খাটে রাত্রি কাটিয়েছেন দুই বেয়াই—বিনোদবাবু আর ভৈরব। ভৈরব তার চিরাচরিত অভ্যাসমত রাত্রির শেষ প্রহরে শয্যাত্যাগ করে বাবুদের পুকুরের বাঁধা ঘাটে স্নান করে এসে চা খেয়ে ছাদ্‌নাতলায় বসে তামাক টানছিল।

চাঁপার সিঁথিতে এখনও সিঁদুর পড়েনি। হোমাগ্নি সংস্কার হবে, কুশণ্ডিকা হবে—তারপর বিবাহ অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি। নবীন তারই ব্যবস্থা শেষ করে ম্যানেজারবাবুর কাছে এসে বসলো। বললে, কাল তো খাওয়াদাওয়ার বিশেষ কিছু ব্যবস্থা হয়নি, আজ আমার ইচ্ছে করছে গ্রামের সবাইকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে দিই।

ম্যানেজারবাবু বললেন, তুমিই তো সব করলে বাবা, তুমি যা বলবে তাই হবে।

—তাহ'লে সরকারকে ডেকে বলে দিন বড়-বাঁধে মণ-চারেক মাছ ধরিয়ে দিক।

—অত মাছ কি হবে ?

নবীন বললে, তার কমে হবে না। আমি বৈকুণ্ঠকে ডেকে এনেছি। ফর্দও একটা করে দিয়েছি। আপনি দেখে-শুনে ওকে বলে দিন।

এমন সময় হরি এসে দাঁড়ালো নবীনের কাছে। বললে, আপনি একবার বাড়ীর ভেতরে আসুন।

নবীন উঠে গেল হরির সঙ্গে।

বাড়ীর ভেতর নবীনের জন্যে যে এত বড় বিস্ময় অপেক্ষা করছে তা' সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

বাড়ীতে এসেই শুনলে, মা এসেছেন।

কোথায় মা ?

—মা! মা! মা!

মস্ত বড় বাড়ী। মহলের পর মহল। ঘরের পর ঘর। কিন্তু তার মাকে নবীন কোনও ঘরেই দেখতে পেলে না।

—মা তাহ'লে গেল কোথায় ?

হরি বললে, এইখানেই তো ছিলেন। তাহ'লে বোধহয় 'গেষ্ট্-হাউসে' গেছেন। দেখে আসব ?

—যা ছ্যাখ্। আমার ঘরটা আমি একবার দেখে আসি।

নবীন তার নিজের ঘরে ঢুকেই দেখে, মা নেই, ঘরের মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে আছে হাস্যাধরা প্রতিমার মত সুধা। কোলে তার নিজেরই সেই পরিত্যক্ত সন্তান।

—এ কী ? তুমি এখানে ? কেমন করে এলে ?

সুধা বললে, মা নিয়ে এলেন।

—মা কি কাল ঝিলিমিলিতে গিয়েছিলেন ?

—হ্যাঁ। গোপাল-মন্দিরে গিয়েছিলেন গোপালকে প্রণাম করতে। সেখান থেকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন মালাকে। আমি মালার সঙ্গে গিয়েছিলাম। মালার মুখে সব কথা শুনলেন।

শুনে বললেন, আয়। তারপর আমাকে নিয়ে সোজা একেবারে কাছারি-বাড়ীতে। সেখানে গিয়ে আমার শাশুড়ীর কাছ থেকে ছেলেটাকে কেড়ে নিয়ে আমার কোলে তুলে দিয়ে বললেন, চল্!

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, তোমার শাশুড়ী চেঁচামেচি করলে না? তোমার শ্বশুর কিছু বললে না?

সুধা বললে, ব্যাটাছেলেরা কেউ বাড়ীতে ছিল না। মাকে দেখে আমার সেই দজ্জাল শাশুড়ী একেবারে কেঁচো।

তারপর মালাদের বাড়ীতে এসে মা বললেন, ওর বাপ্‌টাকে তুই সহ্য করতে পারবি না জানি, কিন্তু ওই ছেলে বড় হয়ে ঠিক পাগলের মত মাকে খুঁজে বেড়াবে, বেঁচে যদি থাকিস তো খুঁজে তোকে সে বের করবেই! তারপর তোর সেই পেটে-ধরা আনন্দগোপাল যখন তার দু'চোখভরা জল নিয়ে তোর কাছে এসে দাঁড়াবে, তখন তার কাছে কী তুই জবাব দিবি তাই বল্!

তারপর সে অনেক কথা। যাক্‌গে, সে-সব কথা বলবার জন্যে তোমাকে আমি ডাকিনি। আমি যে-জন্যে ডেকেছি শোনো!

নবীন বললে, হরিকে তাহ'লে তুমিই পাঠিয়েছিলে আমার কাছে?

সুধা বললে, হ্যাঁ।

নবীন ভাল করে চেপে বসলো। বললে, বল কি বলবে!

—প্রথমে তুমি আমার এই ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বল—তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না কোনদিন?

—সে-কথা না বললেও চলতো, তবু বলছি।

এই বলে ছেলের মাথায় হাত রেখে নবীন বললে, এই আমি ছেলের মাথায় হাত দিয়ে ভগবানকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করছি—তোমাকে আমি জীবনে কোনদিন ভুল বুঝবো না।

সুধা বললে, আজ তোমাকে আমি একটি অনুরোধ করব, সে-

অনুরোধ রক্ষা করতে তোমার যতই কষ্ট হোক্, বল সে-অনুরোধ তুমি রাখবে ?

নবীন বললে, রাখবো।

সুধা আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল; বলতে পারলে না। নীচেকার ঠোঁটটি মনে হলো যেন একটু কেঁপে উঠলো। চোখ-দুটো কেমন যেন ছলছল করে এলো। বললে, আসছি।

বলেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

এমন কী অনুরোধ সুধার থাকতে পারে যা রাখতে তার কষ্ট হবে ?

পেছনে পায়ের শব্দ হতেই ফিরে দাঁড়ালো নবীন।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময় !

সুধার কোলে ছেলে নেই। কিন্তু সঙ্গে রয়েছে মালা।

নবীন বলে উঠলো, তুমিও এসেছ ? কে রইলো তোমাদের বাড়ীতে ?

মালা বললে, গোপাল।

সুধা বললে, জাহন্নামে যাক্ ওর বাড়ী। ও যার জন্যে *এসেছে, তার জন্যে বাড়ীঘর দূরের কথা, নিজের জীবন পর্যন্ত দিয়ে* দিতে পারে !

নবীন বুঝতে সবই পেরেছে। তবু বললে, কার জন্যে ?

মালার হাত ধরে সুধা নবীনের কাছে এগিয়ে এলো। চুপি-চুপি বললে, তোমার জন্যে।

এই বলে মালার একখানি হাত নবীনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললে, মালাকে আমি তোমারই হাতে তুলে দিলাম। একে তুমি নাও। এই আমার অনুরোধ।

যে-মেয়েটিকে অবলম্বন করে সে তার জীবনের গভীরতম এবং গোপনতম একটি আনন্দের অনুভূতিকে এতদিন ধরে পোষণ করে আসছে, আজ যে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে তা প্রকাশিত হয়ে পড়বে

তা সে ভাবতেও পারেনি। ছু'জনের মাঝখানের স্বচ্ছ আবরণটুকু—নবীন ভেবেছিল—একদিন তাকেই উন্মোচিত করতে হবে। সে-সুযোগ তার এসেওছে বহুবার, কিন্তু সব সময়েই একটা সঙ্কোচ এসে বাধা দিয়েছে তাকে। ভেবেছে হয়ত-বা মন্দিরের গোপাল তার হৃদয়-মন্দিরের সবখানি অধিকার করে বসে আছে, সেখানে আর-কারও প্রবেশ-অধিকার নেই।

মালার একখানি হাত নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে নবীন স্তম্ভিত হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। কি যে বলবে, কি যে করবে বুঝতে পারলে না। একবার মালার মুখের দিকে তাকালে। মালা তখন লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিয়েছে। সুধার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে, সে-মুখে সকরুণ মিনতি।

নবীন বললে, আমার আর-কিছু বলবার নেই, কিন্তু ও আমাকে নেবে—তবে তো?

সুধা বললে, ও অনেক আগেই নিয়েছে। আমার মুখ চেয়ে কিছু বলতে পারেনি—এবার চল, ছু'জনে একসঙ্গে গিয়ে মাকে প্রণাম করবে চল।

তিনজনেই বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে। সুধা যাচ্ছিল নবীনের কাছ ঘেঁসে। নবীন তার কানে-কানে জিজ্ঞাসা করলে, আর তুমি? তোমার কি হবে?

—আমার? বলে একটুখানি হাসলো সুধা। সে হাসি কান্নার চেয়েও করুণ। মনে হলো যেন একটি প্রাণান্তকর বেদনার ছায়া পড়লো তার মুখে। জীবন-মন্থনের হলাহল কেমন করে গলাধঃকরণ করতে হয় ভাগ্যবিড়ম্বিতা এই রহস্যময়ী তা জানে।

কথার জবাবটা কিন্তু সে চুপি-চুপি দিলো না, বেশ জোরে-জোরেই বললে, আমার যা হবার তা হয়ে গেছে। তবে তোমাকে আজ আমি নতুন করে পেলাম।

মার ঘরে গিয়ে দেখে অনেক লোক। সরকার, গোমস্তা,

দাস-দাসী অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে। মা বললেন, যাও তোমরা এখন। যাকে যা করতে বললাম—করগে। আজকেই ভাল দিন আছে। আজকেই বিয়ে।

নবীন যেন কিছু জানে না। জিজ্ঞাসা করলে, কার বিয়ে মা?

মা বললেন, তোর।

সর্বনাশ! মাও এই ষড়যন্ত্রের ভেতর আছে তাহ'লে?

নবীন সুধার দিকে তাকালে। সুধা মুখ ফিরিয়ে সরে গেল।

মার কোলে ছিল সুধার ছেলে।

সুধাকে কাছে ডেকে বললেন, এই নে, তোর ছেলে নে। এ তো বেশ ছেলে রে তোর—কাঁদেও না।

সুধা তার ছেলেকে নিয়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

ভৈরব বসে আছে বিন্দুবাসিনীর কাছে। অকল্পিত সৌভাগ্যের আনন্দে আজ যেন সে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেছে। চোখ-দুটো জলে ভরা।

মালা আর নবীন প্রণাম করলে বিন্দুবাসিনীকে।

আশীর্বাদ করে বিন্দুবাসিনী দেখিয়ে দিলেন ভৈরবকে। বললেন, এই যুগেই এদের শেষ। এরকম মানুষ আর জন্মাবে না।

ভৈরব কানে কম শোনে। তাই তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে জোরে-জোরে আবার বললেন, ছেলে-বৌ তো দেখলে, এইবার মেয়ে-জামাই ছাখো।

মেয়ে-জামাই ভৈরবকে প্রণাম করতেই ভৈরব বললে, যা কিছু হচ্ছে মালার মায়ের জন্যে হচ্ছে। হতভাগী দেখতে পেলে না!

নবীন সুধার দিকে একবার তাকালে। মনে হলো তার চোখ দিয়ে টপ্ করে এক ফোঁটা জল পড়লো। কিন্তু ভাল করে দেখা গেল না কিছু। মুখখানা চট্ করে সে জানলার দিকে সরিয়ে নিলে।

নবীনের মনে হলো সুধার কাছে গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু যাওয়া তার সম্ভব হলো না।

ভৈরব ক্রমাগত তখন বলে চলেছে, মালার মা খুব সুন্দরী মেয়ে ছিল, বুঝলেন মা, সেরকম মেয়ে আজকাল দেখা যায় না। আমার কাছে সে কম কষ্ট পেয়েছে। দু'খানা কাপড় একসঙ্গে পরতে পায়নি। ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে করে পরেছে। তবু কোনোদিন আমাকে মুখ তুলে একটা কথা পর্যন্ত বলেনি।

বিন্দুবাসিনী বললেন, স্ত্রীকে কিরকম ভালবাসা ছাখো। মেয়েটা কবে মরে গেছে, তবু এখনও তাকে সে ভুলতে পারেনি। এমনি ভালবাসা না হলে সংসার করা বৃথা।

সুধা তার কোলের ছেলেটাকে চিম্‌টি কেটে কাঁদিয়ে দিলে কি না কে জানে। সেই ছুতো করে সে ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে গেল।

॥ শেষ ॥